নামকরণ

– মোহাম্মদ শাহরিয়ার হোসেন

আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা। বয়স ত্রিশের কোঠায় এবং অবিবাহিত। আগস্ট ১৯৯৯–তে বদলি হয়ে এলাম মফস্বল শহরে। জায়গাটার নাম সঙ্গত কারণেই গোপন রাখছি। একদিন আমার জীবনে ঘটলো অভাবিত এক ঘটনা। বিকেল পাচটার দিকে অফিসে বসে কাজ করছিলাম। এমনি সময়ে চাকরি সূত্রে পরিচিত এক হিন্দু ভদ্রলোক অফিসে এলেন তার স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কোঠায়। ছেলেটি ক্লাস থ্–তে পড়ে এবং বৌদি আমারই সমবয়সী।

বৌদির আকর্ষণীয় রূপ যৌবন দেখে হোচট খেলাম। প্রেমে পড়তে খুব একটা সময় লাগলো না।

পরিচয়ের মাস খানেক পরের ঘটনা। রাতে বৌদির বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল। এর মধ্যে অবশ্য বৌদির বাসায় আরো কয়েকবার গিয়েছি। খাওয়ার পর্ব শেষে আমি, বৌদি এবং তার স্বামী তিনজন মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম। ছেলেটা ঘুমিয়েছিল। বৌদি সেদিন পরেছিল লাল শাড়ি ও গোলাপি ব্লাউজ। বড় গলার ব্লাউজের ফাক গলিয়ে তার বিশাল স্তন দুটি যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। তা দেখে আমার শরীরে যেন হাজারো ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। বিদায়বেলা তার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। তখন আনুমানিক রাত দশটা হবে। ইচ্ছা করেই আমার চাবির রিঙটা বৌদির বাসায় রেখে এলাম। তার স্বামী ব্যবসায়িক কাজে রোজই রাত এগারোটা, সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বাইরে থাকে। তার স্বামীর কাছ থেকে তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিয়ে আবার রওনা দিলাম বৌদির বাসার উদ্দেশ্যে।

বললাম চাবির রিঙয়ের কথা।

মুচকি হেসে আমাকে বসতে বললো। কথা বলার এক পর্যায়ে প্রচণ্ড ঘামছিলাম। ঠিক সে মুহূর্তে বৌদি আমার কপালে হাত দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিলো। আমার সারা শরীরে কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। বৌদিকে জাপটে ধরে তার ঠোটে, গালে, কপালে আর বুকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলাম। হাত বোলাতে লাগলাম তার কোমল, মসৃণ পেটে।

সে রাতের সে ঘটনা অবশ্য আর বেশি দূর এগোয়নি। তবে ওই ঘটনাটা আমাদের প্রেমে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। বৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক দুই বছর পাড়ি দিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক বাধা বিপত্তিও এসেছে সম্পর্কের ওপর। কিন্তু বৌদি যেদিন ওই লাল শাড়িটা পরতো সেদিন যেন সৌভাগ্য এসে ভর করতো আমাদের সম্পর্কের ওপর। তাই আমরা ওই লাল শাড়িটার নাম দিয়েছিলাম *লাকি শাড়ি।*

একদিন বৌদি তার স্বামীর মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠালো তার বাসায়। তার আগে সামান্য এক ঘটনায় অভিমান করে বৌদি প্রায় দিন দশেক আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। রাতে বৌদির বাসায় গেলাম। মান অভিমানের পালা শেষে সে আমাকে জানালো পরদিন সকাল পাচটার দিকে সে একাকী আসবে আমার বাসায়।

দুই রুম ভাড়া নিয়ে এক দোতলা বিল্ডিংয়ের দোতলার এক ফ্ল্যাটে একাই থাকি। বৌদি আমার বাসায় একা আসবে ভাবতেই সারা দেহমন শিহরিত হয়ে উঠছিল। সকাল পাচটার দিকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল, তার মধ্যেই সে এলো। পরনে নীল রঙয়ের জর্জেট শাড়ি, কালো ব্লাউজ।

বৃষ্টিতে বৌদি সামান্য ভিজে গিয়েছিল। সে তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললো, আমি এখন ঘুমাবো।

সেদিন আমার বাসায় সে ঘণ্টা দুয়েকের মতো ছিল। কিন্তু তাকে ঘুমাতে দেয়া দূরের কথা, সারাক্ষণই ব্যস্ত ছিলাম তার ওই ভরা যৌবনা শরীরটা নিয়ে। দৈহিক মিলন বাদে সেদিন আমাদের মাঝে অনেক কিছুই ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে অবশ্য আমাদের দৈহিক মিলন হয়েছিল।

বৌদির সেদিনের আগমন আমাদের ভালোবাসার ওপর বিশাল প্রভাব ফেলেছিল। তাই তো নীল রঙ সবার কাছে বেদনার হলেও আমার কাছে তা *ভালোবাসার প্রতীক।*

বৌদির সবুজ রঙয়ের একটা শাড়ি ছিল। আমরা ওই শাড়িটার নাম দিয়েছিলাম *পাজি শাড়ি।* বৌদি ওই শাড়িটা যতোদিন পরেছে ততোদিনই আমরা সেক্সকে এনজয় করেছি। যেমন একদিন দুপুরে বৌদি ওই শাড়িটা পরে খাটে বসেছিল আর তার স্বামী ওই খাটেই ঘুমাচ্ছিল। আমি বৌদির কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসেছিলাম। সেদিন তার ঘুমন্ত স্বামীর সামনেই আমি তার শাড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে উরুতে হাত বুলিয়েছি, ব্লাউজ ও ব্রা খুলে স্তনে চুমু খেয়েছি। এমনি আরো অনেক ঘটনা সবুজ শাড়িকে ঘিরে।

বৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিতান্তই শারীরিক নয়, গভীরভাবে ভালোবাসি আমরা একে অপরকে। এ জায়গা থেকে দুই তিন মাসের মধ্যে হয়তো বা বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে। আমি মুসলমান। ধর্মীয় সামাজিক এবং আরো বিবিধ কারণে বিয়ে নামক বন্ধন হয়তো বা আমাদের মাঝে হবে না। কিন্তু বৌদির ভালোবাসা চিরঅম্লান হয়ে রবে আমার স্মৃতিতে। লাল, নীল আর সবুজ শাড়ি চিরকালই আমাকে মনে করিয়ে দেবে সৌভাগ্য, ভালোবাসা ও সেক্সের কথা।

গাইটাল, কিশোরগঞ্জ থেকে

স্বপ্নাহত

– মজুমদার আরিফা আহমেদ মিডিয়া

একটু আগেই মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। ল্যাম্প পোস্টের ফ্যাকাশে আলোয় অন্ধকারটা ঠিক জমে উঠতে পারছে না। রাস্তাটার শেষ মাথায় তিন চারটে কুকুর এখনো উচ্ছিষ্টের শেষ অংশটুকু নিয়ে কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত। কাছেই কোথাও এক দূরের শিশু তারস্বরে চেচাচ্ছে। হয়তো ঘুমের ঘোরে পরম অবসাদে চুষতে থাকা স্তনের বোটাটি খুজে না পাওয়ায় সে বিরক্ত। এই কৃপণ পৃথিবীর প্রাচুর্যের মাঝে একমাত্র ওটাতেই যে তার একচ্ছত্র অধিকার। *অধিকার* চার অক্ষরের এই সহজ শব্দটি আমাদের বড় চেনা।

অধিকার মানে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। আরো সহজ কথায় বলা যায় পাওনা। অথচ অজস্র চেনা রেখার যত্রতত্র আকিবুকিতে বিপর্যস্ত প্রায় অচেনা এ সমাজের কাছে এই অধিকার শব্দটির অর্থ জানার অধিকার আমাদের কজনেরই বা আছে?

এই যে আমি উনিশ বছরের এক স্বপ্নাহত তরুণী। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়েছি মানুষ হয়ে বেচে থাকার অধিকার। আমার অপরাধ, আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি। আমাকে মেয়েমানুষ ভাবা যায়। লালসার উন্মত্ত পূজায় প্রতি রাতের বলি হতে হয় বিয়ে নামের এক অদৃশ্য শিকলে।

কৈশোর ফুরানোর আগেই সংসার নামের জটিল পাকের আবর্তে নিক্ষেপ করে কন্যাদায় থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলেন আমার বাবা-মা।

যথোপযুক্ত উচ্চঘরে কন্যাটিকে পাত্রস্থ করতে পারায় সমাজের আর দশজনের সঙ্গে তারাও তৃপ্তির ঢেকুর তুলতেন।

আমার স্বামীরত্নটি ছিলেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, ধনবানের তকমা আটা নিখাদ ভদ্রলোক। তার প্রভুত্বের ষোলআনা নীরবে হজম করতে পারতাম বলেই হয়তো সুগৃহিণীরূপে সংসারে আমার বেশ সুনাম হয়ে উঠেছিল

ড্রইংরুমে শোভা বর্ধনকারী অ্যাকুয়ারিয়ামের রঙিন মাছগুলোর মতো আমিও সেই সংসারের কৌলীন্য বাড়াতাম। কখনো নিরন্তর ছোটাছুটিতে হাপিয়ে উঠতাম।

আমার চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে আমারই ভেতরটা কখনো বা কেপে উঠতো। তবুও রাতের নীরবতায় কাটাছেড়া স্বপ্নগুলোকে ভালোবাসা দিয়ে জোড়া দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতাম। কিন্তু এই স্বপ্ন তৈরির আশ্রয়টুকুও হঠাৎ একদিন ভেঙে গেল।

সমাজের সবগুলো চোখ একই সঙ্গে আমার দিকে ঘুরে তাকালো। সাড়ে দশ হাত লম্বা একখানি শুভ্র বসন আমার এই অপয়া দেহটাকে ঢাকতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

এই পাড়হীন শাদা শাড়িখানি আমার গায়ে অলুক্ষণের লেবাস পরিয়ে দিয়েছে। সংসারের গৃহী মানুষের তাই আমার দিকে ভ্রূ কুচকে বলে, সর্বনাশী, পোড়া কপালি, ভাতার খেকো মাগি।

একখণ্ড শাদা কাপড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে আমার অস্তিত্বের সবটুকু শুভ্রতা, যৌবনের উচ্ছলতা। তবু সে কি মুছে দিতে পেরেছে আমার নির্ঘুম রাতের ছটফটানি, নিদ্রাহীন পোড়া চোখের জ্বলুনি? না, পারেনি।

তাই রাতের অন্ধকারে আমি এখনো আমার আহত স্বপ্নগুলোর সেবা করি, জানি একদিন তারা সেরে উঠবেই।

বয়রা, খুলনা থেকে

নেভি ব্লু

– রশিদ

কেমন আছো মানিক। গত সপ্তাহে ফোন করোনি। আমি সারাটি সপ্তাহ অধীর আগ্রহে প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করেছি তোমার ফোনের জন্য। রিং হলেই ছুটে গিয়েছি, ভেবেছি এই বুঝি তোমার ফোন! কিন্তু না। তুমি কি ভুলে গেলে বাংলাদেশে তুমি তোমার মানিককে রেখে গিয়েছো! নাকি বিদেশি কোনো সুন্দরী মেয়েকে পেয়ে আমার কথা ভুলে গেলে?

এটা ছিল আমার এক সময়ের অতি আদরের, অতি কাছের মানুষের পাঠানো চিঠির উদ্ধৃত একটি অংশ। এমন এক সময় ছিল যখন প্রতিটি সপ্তাহে অন্তত একবার আমার মানিককে ফোন করতে হতো। কোনো কারণ বশত যদি একটি সপ্তাহ ফোন করতে মিস করতাম তাহলেই এ ধরনের হাজারো অনুযোগ শুনতে হতো। এমনো চিঠি পেয়েছি যেটাতে তার বক্তব্য ছিল আমি যদি ধীরে ধীরে টেলিফোন করা কমিয়ে দিই অথবা তাকে ভুলে যাই তাহলে নির্ঘাত আত্মহননই তার কাছে একমাত্র খোলা পথ থাকবে, অন্য কিছু নয়।

কিন্তু না।

১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তার সঙ্গে দেখা হওয়া তো দূরের কথা, টেলিফোনেও কোনো কথা হয়নি। এখানে বলে রাখা ভালো, আমরা একে অপরকে *মানিক* বলে সম্বোধন করতাম।

১৯৮৩ সালে আমি যখন মেডিকালের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয়। বাবা ডাক্তার, সেই সুবাদে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে পরিচয় এবং বাবা–মা ও দুই বোনের সংসারে কোনো এক সময়ে সবার অজান্তে আমিও ওই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাই। তারপর ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৬। দীর্ঘ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও গভীর থেকে গভীরতম হতে থাকে। ভালো ছেলে হিসেবে এরই মধ্যে তার বাবা–মায়ের মৌন সম্মতির বিষয়টি জানতে পারি বিভিন্ন আকার ইঙ্গিতে। এই সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন আমি উচ্চ শিক্ষার্থে পিএইচডি করতে জাপান সরকার কর্তৃক মনবুশো স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত হই।

এই সুসংবাদে আমার মানিকের চোখ দিয়ে আনন্দ অশ্রু পড়তে থাকে এবং তার ওই আনন্দ ভেজা চোখ দুটো আজো আমার মনকে নাড়া দেয়। যাহোক, প্রতি সপ্তাহে একটি চিঠি ও অন্ততপক্ষে একবার ফোন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেশের পথে পা বাড়ালাম। এর মধ্যে দুই দুবার দেশে এসেছিলাম অনেকটা আমার মানিকের টানে। ওই সময় তার ভালোবাসার কোনো কমতি দেখিনি, বরং তা যেন ডালপালা গজিয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছিল। যাক, ওই সব আজ শুধুই স্মৃতি!

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরের কোনো এক রবিবার। অফিস থেকে ফিরে একটি নীল খামে চিঠি পাই। তাতে আমার মানিক লিখেছে, তার কোনো এক আত্মীয় জাপান থেকে একটি জামদানি শাড়ি পাঠিয়েছে। সুতরাং তারও একটা চাই–ই।

আমার জানা মতে, আমি যে শহরে থাকি ওই শহরে কেউ শাড়ি পরে না। কাজেই শাড়ির দোকান থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সঙ্গে সঙ্গে টোকিওতে এক বন্ধুকে ফোন করলাম এবং তাকে বললাম, তোর বৌকে নিয়ে জামদানি শাড়ির দোকান খুজে বের কর, আমি আগামী সপ্তাহে আসছি।

পরের সপ্তাহে তিনজন মিলে খুব ভালো দেখে একটি নেভি ব্লু শাড়ি কিনলাম। কিন্তু বিধি বাম! জরুরি একটি কনফারেন্স থাকার জন্য প্রফেসরের কাছে ছুটি নিতে পারলাম না। এক মাস পর ছুটি পেলাম। একদিক দিয়ে মনে মনে খুশি হলাম। কারণ ওই মাসেই আমার মানিকের জন্মদিন। হংকং থেকে অর্ডার দিয়ে এক জোড়া পার্লের নেকলেস কিনলাম।

জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ফুফুওকা থেকে প্লেনে উঠলাম। মাত্র সাড়ে আট ঘণ্টার জার্নি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এরই মধ্যে আট মাস পেরিয়ে গেছে। জিয়া আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি তাদের বাসায় উঠলাম। রাতেই সুটকেস খুলে অন্যান্য উপহার সামগ্রীর সঙ্গে তার হাতে তুলে দিলাম

সেই নেভি ব্লু শাড়ি। এগুলো পেয়ে মানিক সবার সামনে হঠাৎ কেদে ফেললো। তখনো আমি বুঝতে পারিনি ওই কান্না তার আনন্দের কান্না নয়, হয়তো আত্মগ্লানির।

পরের দিন অনেক জোরাজুরির পর সে আমার দেয়া শাড়িটি পরলো। কিন্তু আমি তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দ্বিতীয়বার তাকাতে পারলাম না। বিকেলে তার আব্বার মুখে শুনলাম গত দুই তিন সপ্তাহ আগে কোনো এক আর্মি ক্যাপটেনের সঙ্গে তার পরিচয়। খুবই বড়লোকের একমাত্র ছেলে। ঢাকাতে বাড়ি, গাড়ি সবই আছে। তারপর থেকে তারা নাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিফোনে কথা বলতো। মাত্র গত সপ্তাহে সে তার বাবা মাকে জানিয়ে দিয়েছে ওই আর্মি ছেলে ছাড়া কাউকে সে বিয়ে করবে না।

এক মাসের ছুটি কমিয়ে পরের সপ্তাহে কর্মস্থলে রওনা হলাম। তারপর বিভিন্ন দেশ ঘুরে গত বছর ঢাকায় ফিরলাম।

আমি আর এখন কোনো নেভি ব্লু শাড়ি পরিহিতা কারো মুখের দিকে তাকাই না। আমি স্মরণ করতে চাই না আমার মানিকের ওই আত্মগ্লানি ভরা মুখ।

ঢাকা থেকে

শেষ অনুরোধ

– সুব্রত রায়

তখন প্রাইমারিতে পড়তাম। তেমন কিছু বুঝতে না পারলেও লাবণ্যকে কোনোদিন না দেখলে বুকের কোথায় জানি চিন চিন করতো। যখন দেখা পেতাম তখন পরম তৃপ্তিতে বুকটা ভরে যেতো। একই ক্লাসে পড়তাম। তাই পাশাপাশি বসে চিমটি কাটা, আমার নাম তার শরীরে লেখা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল। আমাদের বাড়ি থেকে তাদের বাড়ি বেশ দূরে। তাই স্কুলে ছাড়া আর দেখা হতো না। প্রাইমারি ছেড়ে যখন হাই স্কুলে তখন ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে গেল। সে সম্পর্কে আমার ভাগ্নি। আমি তাকে আন্টি বলে ডাকতাম।

মধুর খুনসুটির মধ্যে সে সময়টা বেশ কেটে যেতো। আমাদের পরিবার ব্যাপারটি জানলেও তেমন আমল দিতো না। এভাবে স্কুল পেরিয়ে কলেজ, অতঃপর লাবণ্য ডিগ্রি পাস করলো আর আমি সেশন জটের গ্যাড়াকলে পরে আজো প্রকৌশলী হতে পারলাম না। ভালো না লাগলে মাঝে মধ্যেই বাড়িতে চলে যেতাম তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিছুদিন থেকেই শুনছি তার বিয়ের জন্য তার বাবা–মা উঠে–পড়ে লেগেছে এবং কয়েকদিন আগে লাবণ্যর চিঠি পেলাম। লিখেছে, তার বিয়ে ঠিক হওয়ার পথে এক ডাক্তারের সঙ্গে। তাকে লিখলাম সব নিয়তির হাতে, তুমি এবং আমি উপলক্ষ মাত্র। যার সঙ্গেই বিয়ে হোক না কেন, তুমি সুখী হবে এটাই পরম করুণাময়ের কাছে কামনা।

এদিকে ক্যাম্পাসে হঠাৎ শিবির–ছাত্রদল বন্দুকযুদ্ধের পর ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করায় বাড়িতে চলে এলাম। বাড়িতে পৌছে শুনি লাবণ্যর বিয়ে দুদিন পরেই। এদিকে ঘণ্টা খানেক পর লাবণ্যের ছোট ভাই এসে হাজির। কার কাছে যেন আমার আসার সংবাদ পেয়েছে।

বললো, মামা, মা ডেকেছে বাসর ঘর, ছায়ামণ্ডপ ছাড়াও সারা বাড়িতে আল্পনা আকতে হবে।
তুমি যাও, আমি পরে আসছি বলে তাকে পাঠিয়ে দিলাম। যেতে মন সায় না দিলেও মায়ের পীড়াপীড়িতে গেলাম। শহর থেকে রঙ কাগজ নিয়ে এলাম। দরদ দিয়ে আল্পনা আকলাম। ছায়ামণ্ডপ (যেখানে কন্যা সম্প্রদান করা হয়) সাজালাম। শেষে বাসর ঘর সাজাতে গেলাম। দুইদিনে একবারও লাবণ্যর দেখা পেলাম না। তাই মনটা একটু ভারাক্রান্ত। পরে শুনলাম বড় বোন ও দাদুর বাড়ি গেছে থোবর ভাত খেতে অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে শেষ খাওয়া। বিয়ের দিন বিকেলবেলা এলো। আমি তখন বাসর ঘর সাজাতে ব্যস্ত। রুমে ঢুকলো, চোখাচোখি হলো। দুজনেই নির্বাক। কাছে বসলো। আমার কাজের প্রশংসা না করে বললো, তোমার কি একটুও খারাপ লাগছে না? এই কয়েকদিন আগেও যে স্থানটা তুমি দখল করেছিলে সে স্থানটা দখল করে নিচ্ছে অন্যজনে...। বলেই ফুপিয়ে কেদে উঠলো।
তখন সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুজে পাচ্ছিলাম না। রুম থেকে সে বেরিয়ে গেল।
কিছু সময়ের মধ্যে পাত্রপক্ষ এসে যাবে। তাই সময় নিয়ে চন্দন ঘষা দিয়ে তাকে সাজাচ্ছি। রুমে লাবণ্য আর আমি। সবাই অন্য কাজে ব্যস্ত। অর্ধেক সাজানো হয়েছে এমন সময় হঠাৎ সে আমার চুল টেনে আমার মুখটা আরো কাছে নিয়ে আমার ঠোটে নিবিড় চুমু দিল। আমি ঘটনার আকস্মিমতায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে চোখের জলে সাজানো নষ্ট হয়ে গেছে। ধমকের সুরে বললাম, অনেক কেদেছো, আর কাদতে হবে না। অতীতকে ভুলে যাও। যা আসছে তাই নিয়ে সুখে থাকো।
সাজানো শেষ হলে তার হাতে বিয়ের শাড়ি দিয়ে বললাম, এটা পরে নাও। নাশতার টাকা বাচিয়ে অনেক কষ্টে জমানো দুই হাজার সাতশ টাকায় শাড়িটি কিনেছি। আমার শেষ অনুরোধ রাখবে, এ শাড়ি পরেই তুমি শ্বশুরবাড়িতে যাবে।
আমার কথা সে রেখেছে। তার বাবা-মায়ের দেয়া ও শ্বশুরের দেয়া শাড়ি না পরে আমার দেয়া শাড়ি পরে স্বামী-শ্বশুর বাড়ি গেল। বিদায়বেলা ছোট-বড় সবার চোখে জল। সবার কাছে আমি নাকি নিষ্ঠুরদের দলের একজন। তবুও চোখে বাধ ভেঙে জল নামলো।

বিআইটি, চট্টগ্রাম থেকে

টিচার

– শহীদ শিকদার

ঘটনার দিন তারিখ অতো মনে রাখিনি। সময়টা ছিল সন্ধ্যাকাল। স্থান : মৌচাক মার্কেটের একটি শাড়ির দোকান। দোকানটির স্বল্প পরিসরে একটা টুলে বসে দামে দুর্লভ, গুণে নেহায়েতই সাধারণ মানের সুতি শাড়ি দেখছিলাম।
সেলসম্যান দুইজন আমার মতো কম দামি এক খদ্দেরকে ঘায়েল করতেই তাদের পেশাসুলভ কলাকৌশলের সুনিপুণ প্রয়োগে তখন দারুণ ব্যস্ত। দোকানের কোণায় বসা নাদুস-নুদুস মালিক একটু

উত্তেজিত হয়ে কিছু বলছিলেন। ওদিকে চোখ গেল। একটু শুটকো মতো এক লোক মালিক মহাশয়কে কি যেন কি বোঝাতে চাইছেন বার বার আর দোকানিপ্রবর ওসব কথায় আমলই দিতে চাইছেন না। শাড়ি দেখা রেখে সে লোকের কথায় মনোযোগ দিলাম হয়তো বা তার কিছুটা অসহায় ভাব দেখেই। অতি সাধারণ বিষয়। হরহামেশাই ঘটে থাকে যা আমাদের অনেক দোকানেই, এ দেশের হাটবাজারে।

ভদ্রলোকের সমস্যাটি ছিল এ রকম :

দোকান থেকে শাড়ি কিনে বাসায় গিয়ে দেখেন বারো হাত বলে গছানো কাপড়টি লম্বায় মাত্র দশ হাত! তিনি এখন ওই শাড়িটার বদলে একখানি বারো হাত শাড়ি চান। আর দোকানি সাহেব কোনোমতেই তাতে রাজি হচ্ছেন না। তার মহাজনী নীতি হচ্ছে, *একবার বিক্রয় হইলে মাল আর ফেরত লওয়া যায় না, কিনিবার কালে অবশ্যই দেখিয়া লইবেন* ইত্যাদি।

না, বদলেও দেয়া যাবে না।

ফাইনাল কথা জানিয়ে দিয়ে তারা আমার দিকে মনোযোগ দেন। দেখলাম তখনো সেই দশ হাতি শাড়ির প্যাকেট হাতে শুকনো মতো লোকটি মুখখানি আরো শুকনো করে কাচুমাচু হয়ে এক অসহায় ভঙ্গিতে দাড়ানো। অতো কথার পরও দোকান ছাড়ছেন না। এবং দোকানি মহাশয়ও তাকে যেন আর চোখেই পড়ছে না এমন ভাব করে আমার শাড়ি দেখার দিকে মনোনিবেশ করেন।

লোকটি অতীব বিনয়ের সঙ্গে আবার নিবেদন করেন। দ্যাখেন ভাইসাব, আপনারা অন্য শাড়ি দেখানোর কালে মাপামাপি করেই দেখিয়েছিলেন সত্য। ওসব বারো হাতের। যখন এ শাড়িটা পছন্দ করি, তাড়াহুড়ো করেই প্যাকেট করে দিলেন। আমারও আর মেপে দেখার কথা খেয়াল হয়নি। বাসায় গিয়ে দেখি এটা মাত্র দশ হাতি। ভাইজান, আমার ওয়াইফ একটু মোটাসোটা মানুষ। তিনি এ শাড়িটা পরতেই পারবেন না। শাড়ি তার খুবই দরকার। যথেষ্ট হতাশা মাখানো সুরে আরো বলেন, আমি একজন স্কুল টিচার। বছরে এক, আধখান শাড়ি কাপড় কিনতেই হিমশিম খাই। শাড়িটা বদলে না দিলে এ বছর ওয়াইফকে আর কাপড়ই কিনে দিতে পারছি না। ভাইসাব, দয়া করে কাপড়টা বদলে দিন।

দোকানি তার সিদ্ধান্তে অটল। একটু অবজ্ঞার সুরেই বলেন, যান যান সাহেব, আর বিরক্ত করবেন না একটা শাড়ি নিয়ে। কেনার সময় দেখে নিলেন না, এখন এসে সময় নষ্ট করছেন এই বেচাকেনার সময়। আপনি টিচার তো আমরা কি করবো? কাপড় একবার বেচা হয়ে গেলে আর বদলানো যায় না।

ফাসির রায় শোনা আসামির মতো দাড়িয়েই রইলেন এ রাজধানী শহরের কোনো এক বিদ্যাপীঠের সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়। ফিরে যাবার পথ বন্ধ! ঘরে নিশ্চয় রুষ্ট গিন্নি। এদিকে ধনুক ভাঙা পণ দোকানির। ভদ্রলোকের জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ অবস্থা! যাবেন কোথায়?

সালটা ছিল সম্ভবত ১৯৭৪। বাংলাদেশের বেতন সর্বস্ব চাকরিজীবীদের জন্য একটা অতীব দুর্বিষহ কাল। *নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।* ভদ্রলোকটি যে আগামী ছয় মাসেও আরেকটি শাড়ি যোগাড় করতে পারছেন না এ বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। শিক্ষক মানুষ! তাকে অনুরোধ করলাম, স্যার, আপনি টুলটাতে বসুন।

সামনেই দুই তিনটা খালি টুল ছিল। আমি ছাড়া আর কোনো খদ্দেরও ছিল না। তিনি তার একটাতে রাজ্যের হতাশা নিয়ে বসলেন। দোকানিকে সবিনয়ে বললাম, শাড়িটা বদলে দিতে বলুন। তিনি যে মাপের চান তেমন শাড়িই দিতে বলুন। ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ?

না, তা হচ্ছে না।

দোকানি সাহেব আর তার সেলসম্যান দুজনই অনড়। ব্যবসা করতে বসেছেন। ওসব টিচার ফিচারে আমল দিলে কি আর ব্যবসা চলে? কাজেই শাড়ি বদলে দেয়া যাবে না।

এবার আমিও ক্ষুব্ধ হলাম। একটু চড়া সুরেই বলে ফেলি, আপনারা ব্যবসা করছেন ভালো কথা। এটাও ভালো করেই করুন। কাপড়টা না মেপে আপনারাই গছিয়ে দিয়েছিলেন। ঠিকমতো কাপড় না হলে অবশ্যই বদলে দেবেন। ভদ্রলোক বলেই ফেলেছেন তিনি একজন টিচার। ওনার পক্ষে আরেকটা কাপড় কেনা এদিনে এক্ষুণি সম্ভব নয়। ব্যবসা করছেন বলে কি জীবনে কখনো স্কুলে যাননি? কখনো টিচার দেখেননি? একজন শিক্ষকের কথার মর্যাদা বোঝেন না? সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও নেই তার জন্য? আপনার সন্তানরাও নিশ্চয় লেখাপড়া করে! ব্যবসা করতে বসে সব ভুলে বসে আছেন? এই আমি এখানে বসলাম। এ শাড়ি বদলে না দিলে উঠছি না। দেখি আপনাদের ব্যবসা করা!

শেষের দিকে কথাগুলো একটু কড়াই হয়ে যাচ্ছিল। মনে হলো দোকানি মহাশয়, একটু দ্বিধার মধ্যে পড়লেন। একটু ভাবিত মনে হলো তাকে। অবশেষে বিরক্ত মাখা কণ্ঠেই সেলসম্যানদের হুকুম দিলেন, দ্যাও, বদলে দ্যাও ওনার কাপড়।

ভদ্রলোক আশ্বস্ত হয়ে দেখেশুনে মেপে একটা শাড়ি নিলেন সেই দশ হাতি শাড়ির বদলে। আর প্রসন্ন মুখে আমাকে একটা ছোট্ট ধন্যবাদ দিয়ে দোকান ছাড়লেন। তার আগে তাকে সতর্ক করে দিলাম, স্যার, কাপড়-চোপড় কেনাকাটা করার কালে মাপজোখ একটু দেখে নেবেন। সব মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না।

ভদ্রলোকের শুকনো মুখে একটা লাজুক হাসি ফোটে।

মালিবাগ, ঢাকা থেকে

ধূসর

– হুমায়ুন কবির

মানুষের হৃদয়ের ধূসরতা যে প্রকৃতির ধূসরতাকে হার মানায় তা আমার মায়ের দিকে তাকালেই আমি বুঝতে পারি। স্বাভাবিক পরিবারগুলোর মতোই আমাদের পরিবারটা ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দে গোছালো। আমরা দুই ভাই-বোন আর বাবা-মা মিলে ভালোই কাটছিল আমাদের দৈনন্দিন জীবন। বাবা অফিস থেকে এসে যখন আমাদের কোলে নিতেন, মনে হয় পৃথিবীতে আর সুখের অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সেই সুখ বেশি দিন স্থায়ী হলো না। এক ভয়ঙ্কর অসুখ দানা বাধলো আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবার শরীরে। বাবার ব্রেইন ক্যান্সার। বাবা তার রোগের কথা জানতেন। কিন্তু আমাদের জানাননি। অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল যথাযথ চিকিৎসা করার জন্য। অতো টাকার সংকুলান হবে না ভেবে তিনি হয়তো

মৃত্যুকেই বেছে নিলেন। একদিন এক গভীর রাতে আমাদের প্রিয় বাবা আমাদেরকে অসহায় রেখে দুনিয়ার মায়া থেকে চলে যান।

তখন থেকে আমার মায়ের সেই মিষ্টি রঙের শাড়িগুলো হারিয়ে গেল জীবন থেকে। মাকে পরিয়ে দিল চিরাচরিত শাদা রঙের কাপড়। যেই মাকে শাড়ি পরে দেখে মনে হতো পৃথিবীতে আর হয়তো এ রকম রূপসী মা নেই। আজ সেই একই শরীরের মাকে চরম বিষণ্ণতা নিয়ে বাস করতে হয়। কোনো একটা শাড়ির রঙ পছন্দ না হলে মায়ের পছন্দ অনুযায়ী বাবা নতুন রঙ-বেরঙের শাড়ি কিনে দিতেন। শাড়ি পেলেই মা খুব খুশি হতেন। মনে হয়, মা বুঝি আজ আমাদের বেশি আদর করবেন। কিন্তু সব কিছু ঢেকে গেছে ধূসরতায়। যেহেতু আমাদের মায়ের বয়স খুব একটা বেশি হয়নি সেহেতু আমার নানা, নানু অনেকটা জোরাজুরিতে মাকে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন।

অবশেষে মা হয়তো আমাদের কথা ভেবে বিয়েতে রাজি হলেন। আমরা এক অপরিচিত বাবাকে ঠিকই পেলাম। কিন্তু সেই দিনগুলোর মতো প্রাণোচ্ছল ধারা পেলাম না। এখন আমার মা নতুন করে রঙ-বেরঙের শাড়ি পরেন তবে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে কষ্টে বুকটা ফেটে যায়। আমরা এই কোন মাকে দেখছি?

আজ অনেক বড় হয়েছি। ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি। তবুও সেই দিনগুলোর দুঃসহ স্মৃতি আজো ভুলতে পারি না। খুব ভয় হয় আমাদের প্রাণপ্রিয় মা-দের যেন আর শাদা কাপড় পরতে না হয়। তাদের সারাটি জীবন যেন রঙ-বেরঙের শাড়িতেই কেটে যায়। কোনো ধূসরতা যেন আমাদের গ্রাস করতে না পারে।

সিলেট থেকে

দিগন্ত জোড়া

– আশীষ কুমার রায়

১৯৯১ সালে ভাওয়াল বদরে আলম কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। বড় বোন কালিয়াকৈর কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। বড়দি ও তার বান্ধবীরা ওই কলেজের এক স্যারের কাছে ইংরেজি বিষয়ে প্রাইভেট পড়বে। আমাদের বাসা থেকে স্যারের বাসার দূরত্ব বেশ খানিকটা। তাই মা সিদ্ধান্ত নিলেন, ওই ব্যাচে আমারও পড়তে হবে দিদির সঙ্গে। অগত্যা কি করা! বড়দির সঙ্গে প্রথম দিন স্যারের বাসায় গেলাম। স্যারের সঙ্গে ও তার ক্লাসমেটদের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন দিদি। তার মধ্যে তিন চার বান্ধবীকে অনেক আগে থেকেই চিনতাম। বাকিদের মধ্যে একজন ছাড়া অন্যদেরও ছবিতে দেখেছি। সম্পূর্ণ নতুন যার সঙ্গে পরিচয় হলো তার নাম শিল্পী। বাবা সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। কালিয়াকৈর নতুন এসেছে। সবাই সালোয়ার কামিজ পরে এলেও সে পরেছে নীল রঙের টাঙ্গাইলের জামদানি শাড়ি। কপালে নীল টিপ। হাতে নীল রঙের চুড়ি যেন এক নীল পরী স্বর্গের মায়া ত্যাগ করে মর্তের বুকে নেমে এসেছে।

স্যার পড়ানো শুরু করলেন। পড়ার ফাকে ফাকে শিল্পীদির মনোমুগ্ধকর চেহারার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলাম বার বার। ব্যাপারটা অন্য কেউ খেয়াল না করলেও তার চোখে ধরা পড়ে গেলাম। আমার দিকে তাকিয়ে সেও মিটিমিটি হাসছিল। পড়া শেষে দিদিকে নিয়ে বাসায় ফিরলাম। সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। চোখের সামনে নীল পরীর মতো শিল্পীদির চেহারা ভাসতে লাগলো। জীবনে প্রথম প্রেমে পড়লাম নীলে নীলে সাজা বড়দির বান্ধবী আমার এক বছরের সিনিয়র শিল্পীদির সঙ্গে। মনে হলো তাকে যদি আপন করে না পাই তাহলে আমার এ জীবনটা বৃথা।

পরের দিন খুব সকালবেলা ঘরের সমস্ত দরজা–জানালা বন্ধ করে বাবার রেজর দিয়ে জীবনে প্রথম শেভ করলাম। শেভ করার পর বার বার আয়নার তাকাচ্ছিলাম। নিজেকে মনে হচ্ছিল এক রাজকুমার যে কিনা এক্ষুণি বের হবে দেশ ভ্রমণে এবং রাক্ষসদের হাত থেকে রাজকুমারী নীলকুমারীকে উদ্ধার করবে।

ঘর থেকে বের হবার পর দিদিই প্রথমে আমাকে খেয়াল করে বললো, তুই শেভ করেছিস? তারপর তার সে কি হাসি! বাড়ির সবাইকে তথ্যটা জানিয়ে দিল।

আমাকে এভাবে লজ্জায় পড়তে দেখে ঠাকুরমা বললেন, পুরুষ মানুষ, শেভ তো করবেই।

ঠাকুরমায়ের কথায় সাহস খুজে পেলাম। ওইদিন কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরলাম। বাসায় ফিরে রেডি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন স্যারের বাসায় পড়তে যাবো।

স্যারের বাসায় গিয়ে দেখি সবাই এলেও আমার সেই কাঙ্ক্ষিত নীলপরী শিল্পীদি আসেনি। স্যারকে মিতুআপু বললেন, শিল্পী গতকাল বাসায় ফেরার সময় রিকশার চাকার সঙ্গে তার শাড়ির আচল আটকিয়ে যাওয়ায় রিকশা থেকে পড়ে সে বেশ ব্যথা পেয়েছে এবং শাড়িটাও ছিড়ে গেছে। এ কথা শুনে আমার তখনি ইচ্ছা হচ্ছিল তার বাসায় গিয়ে তাকে একবার দেখে আসতে।

পরের দিন শুক্রবার। পড়া শেষে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল, আগামীকাল সকালে অসুস্থ শিল্পীদিকে দেখতে যাবে। বাসায় ফিরে মনে মনে ভাবতে লাগলাম কি নিয়ে তাকে দেখতে যাওয়া যায়? দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু তার সিদ্ধান্ত আমার মনে ধরলো না। রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখি শিল্পীদি সেই নীল জামদানি পরে দাড়িয়ে আছে আমার সামনে। ছেড়া শাড়ির ভেতর দিয়ে শরীরের কয়েকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। এর ফলে সে বেশ লজ্জা পাচ্ছে।

শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার নজরে পড়লো টেবিলের ওপর আমার জমানো মাটির ব্যাংকটির ওপর। দিদিকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাংকটা ভাঙলাম। আটআনা আর চারআনা গুণে গুণে দেখলাম সব মিলে চারশ বিশ টাকা পচিশ পয়সা। খুচরাগুলো বাবার কাছে দিয়ে তার কাছ নোট নিয়ে নিলাম। টাকাগুলো দিদির হাতে দিয়ে বললাম, শিল্পীদির জন্য একটা নীল জামদানি শাড়ি কিনে নিয়ে যাবো। শিল্পীদির বাসায় যাওয়ার আগে মার্কেট থেকে চারশ টাকা দিয়ে একটি টাঙ্গাইলের নীল জামদানি শাড়ি কিনলাম। আমার কাছ থেকে এমন অদ্ভুত গিফট পেয়ে শিল্পীদি সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমার হাত ধরে কাছে টেনে আমার কপালে আলতো করে চুমু খেলো। লজ্জা ও শিহরণে আমার তখন মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীটা জয় করে ফেলেছি।

বাসায় ফিরে শিল্পীদিকে নিয়ে এক স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলাম মনে মনে। এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। কিন্তু শিল্পীদি আর স্যারের কাছে পড়তে এলো না। আমার মনটা দুঃখের সাগরে ভাসতে

লাগলো। শুক্রবার বিকেলে বিটিভিতে সিনেমা দেখছি। তখন শিল্পীদি আমার দেয়া নীল জামদানি শাড়ি পরে আমাদের বাসায় এলো। আমার তখন মনে হচ্ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছি আমি। এবার আমার প্রেম সার্থকতার রূপ নেবে। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো তার ডান হাতে বিয়ের কার্ড। দিদির হাতে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রটি দিয়ে বললো, আগামী রবিবার দিন বিয়ে এবং বৃহস্পতিবার দিন স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা চলে যাচ্ছি। আসলে বিয়ের রেজিস্ট্রি হয়েছিল বছরখানেক আগে। এবার শুধু আনুষ্ঠানিকতা হবে।

কথাগুলো শোনামাত্র আমার মনে হতে লাগলো, আমার পায়ের সমস্ত মাটি যেন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে শিল্পীদি আমার মাথার চুল আলতো করে হাত বুলিয়ে বললো, আমার কোনো ভাই নেই। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো। বিয়ে থেকে শুরু করে চলে যাওয়া পর্যন্ত তুমি আমার পাশে থাকবে।

শিল্পীদির ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলাম না। জীবনের প্রথম ভালোবাসা সাগরের উত্তাল বুকে বিসর্জন দিলাম তার মনোমুগ্ধকর কথায়। বিয়ের বাজার থেকে শুরু করে অতিথিদের আপ্যায়ন পর্যন্ত তদারকি করলাম। শিল্পীদি তার কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার বর–এর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিল। তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি জীবনে অনেক বড় প্রেমিক হতে পারবে।

এ কথা শুনে রুমে সবাই হেসে দিল। হাসলো না শুধু শিল্পীদি।

আমেরিকা চলে যাওয়ার আগের দিন শিল্পীদি আমাকে ডেকে বললো, এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমাকে তুমি পৌঁছে দেবে।

তার কথায় মাথা নেড়ে বললাম, আমার একটা ইচ্ছা ছিল।

কি ইচ্ছা?

বললাম, চলে যাওয়ার দিন যদি আমার দেয়া সেই নীল জামদানি শাড়িটা পরে আমেরিকা যেতেন তাহলে আমার খুব ভালো লাগতো দিদি।

আমার কথা শুনে সে মৃদু হেসে বললো, ছোট ভাইয়ের একটা ইচ্ছা আমি পূরণ না করেই এ দেশ থেকে চলে যাবো?

তারপর বেশ কয়েকজন আত্মীয়স্বজন নিয়ে পরের দিন এয়ারপোর্টে গেলাম সকাল দশটায়। আমার ইচ্ছা অনুযায়ী শিল্পীদি আজ সেই নীল জামদানি শাড়িটা পরেছে। কপালে নীল টিপ, কানে নীল রঙের দুল, হাতে নীল চুড়ি। ইমেগ্রেশনে ঢোকার আগে শিল্পীদি আমার কপালে আলতো করে চুমু দিয়ে বললো, ভালো থেকো, চলি ভাই।

আমি নিজের কান্নাকে ধরে রাখতে পারলাম না।

চোখের জল মুছতে মুছতে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। বিমানটি নীল আকাশের বুকে উড়াল দিল। নীলে নীলে সাজা এক স্বপ্নের নীল পরীকে নিয়ে বিমানটি আস্তে আস্তে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমার সামনে শুধু পড়ে রইলো দিগন্ত জোড়া নীল আকাশ।

কালিয়াকৈর, গাজীপুর থেকে

স্বপ্ন

– রাহাত

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে চলে এলাম চট্টগ্রামে।

বড় ভাইদের সহযোগিতায় পেয়েও গেলাম একটা টিউশনি।

মাস শেষে পেলাম অপ্রত্যাশিত বেতন। টাকাটা কিভাবে খরচ করবো বুঝে উঠছিলাম না।

খুব শখ করে মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনলাম।

কখনো শাড়ি কেনার অভিজ্ঞতা না থাকায় মনে খুব সংশয় যদি পছন্দ না হয়। ঈদের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে মাকে শাড়িটি দিলাম আর বললাম, তোমার ছেলের উপার্জনে কেনা এই শাড়ি।

আমার বাবা এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন।

তারপর থেকে মায়ের যে কোনো ব্যাপারে উৎসাহ কমে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে কেদে বলেছিলেন, আমার শাড়ির দরকার নেই। তুমিই আমার শাড়ি। তুমি মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেচে থেকে শাড়ির মতোই আমাকে জড়িয়ে রাখো এই দোয়া করি।

আমি নিজেকে প্রস্তুত করছি মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে।

আমি চাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে আমার মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে।

চট্টগ্রাম থেকে

অসীম আদর

– কনক কমল

বাবা–মায়ের সাত ছেলেমেয়ের মধ্যে একমাত্র মেয়ে আমি। স্বাভাবিকভাবেই বাড়াবাড়ি রকমের আদর আমার। আব্বা–আম্মা তাদের মেয়েকে বিভিন্নভাবে সাজাতে চাইতেন। সাজানোর জন্য কখনো এটা কিনে দিচ্ছেন আবার কখনো ওটা। তারই নিদর্শন স্বরূপ আমার বয়স যখন পাচ তখন আব্বা একদিন আমার জন্য একটা শাড়ি কিনে আনলেন। লাল–নীল–হলুদ এবং কালো রঙের চেক শাড়ি। খুব পছন্দ হলো আমার। আব্বা শাড়িটা এনেই হই চই শুরু করে দিলেন। কই গো, মেয়েকে আনো, শাড়িটা পরিয়ে দিই।

নিজের হাতে আমাকে তিনি শাড়িটা পরিয়ে দিলেন। ছোট্ট মেয়ে আমি। খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম। এমন সময় পাশের বাসার ছোট ছেলেটা যার বড় ভাইয়ের নাম এবং আমার নাম এক সে এসে আধো আধো গলায় বললো, *এমা! শাড়ি পরেছে, আমার এ কনকের সঙ্গে তোমার কনকের বিয়া দেবো।*

সবাই এ কথা শুনে হাসতে লাগলো শুধু আমি ভ্যা করে কেদে দিলাম। টান দিয়ে শাড়িটা খুলে ফেললাম, ছুড়ে দিলাম আম্মার কোলে। আব্বার কোলে মাথা গুজে কাদতে শুরু করলাম।

স্কুলে ভর্তি হয়েছি। বড় হয়ে যাচ্ছি আমি, সেই সঙ্গে আমার শাড়িটাও ছোট হয়ে যাচ্ছে। আমার খুব কষ্ট হয় শাড়িটার জন্য। ওটা পরলে এখন হাটু দেখা যায়। ছোট হয়ে যাচ্ছে শাড়িটা। তবুও পরি

মাঝে মধ্যেই। কিছুদিন পরে দেখা গেল, শাড়িটা আমি প্রতিদিনই পরছি। ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাই বেশি বেশি করে পরে নেয়ার ইচ্ছা।

খুব ভালো লাগে পরতে। টেনে টেনে বড় করতে চাই শাড়িটা। কিন্তু কোনো লাভ হয় না। স্কুলে গিয়ে ভাবি, কখন বাসায় যাবো আর শাড়িটা পরবো। আম্মা আমার কাণ্ডকারখানা দেখে আরেকটা নতুন আকাশি রঙের শাড়ি কিনে দিলেন। সেটা আমার পছন্দ হলো না। আমার ওই শাড়িটাই চাই। লাল, নীল, হলুদ, কালো রঙের চেক শাড়িটা।

আম্মা একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, প্রতিদিন এটা পরবি না তো! দেখলেই বিরক্ত লাগে।

এ কথা বলে তিনি শাড়িটা আমাদের কাঠের আলমারির উপরের তাকে রেখে দিলেন। আমার খুব মন খারাপ। শাড়িটা পরতে না দিক অন্তত একটু ছুয়ে তো দেখতে দেবে। সেটাও দিচ্ছে না। সারাক্ষণই লুকিয়ে লুকিয়ে কাদছি।

সেদিন স্কুল ছিল হাফডে। বাসায় এসে দেখি আম্মা ঘুমিয়ে আছেন। এই–ই সুযোগ। সময় নষ্ট না করে দৌড়ে গেলাম আলমারির কাছে। খুব আস্তে আস্তে আলমারিটা খুললাম। উহু! উপরের তাকটা হাতে পাচ্ছি না তো। চেয়ার আনলে ভালো হতো। কিন্তু চেয়ার টানাটানি করতে গেলে আম্মার ঘুম ভেঙে যাবে। বরং প্রথম তাকটার উপরে উঠে চেষ্টা করি। মনে হচ্ছে নাগালে পাবো। তবে এখানেও ভয় আছে। উঠতে হবে খুব সাবধানে। কারণ আলমারি ভর্তি চিনামাটির বাসনপত্র, আম্মার অতি শখের ডিনার সেট।

পা টিপে টিপে পার হলাম প্রথম তাক, পা রাখলাম দ্বিতীয় তাকে। ওই তো শাড়িটা এবার দেখতে পাচ্ছি। মন ভরে গেছে খুশিতে। চোখ আনন্দে চক চক করছে। এতোদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে আমার প্রিয় শাড়ি। হাত বাড়ালাম অতি কাঙ্ক্ষিত শাড়ির দিকে। এমন সময় হঠাৎ করে আমার পা পিছলে গেল। আমার ভার সামলাতে না পেরে আলমারিটা সামনের দিকে একটু ঝুকে এলো। অমনি ঝন ঝন শব্দ। আম্মার শখের ডিনার সেট ভেঙে চুরমার। তারপর আর কি?

আম্মার প্রচণ্ড বকা। একমাত্র মেয়ে হওয়ার সুবাদে পিটুনির হাত থেকে বেচে গেলাম। কিন্তু বাসার কেউ–ই বকা দিতে ভুললো না। খুব রাগ হলো শাড়িটার ওপর। হতচ্ছাড়া শাড়ি, তার জন্য আজ আমাকে এতোগুলো বকা খেতে হলো। শাড়িটা নিয়ে স্টোর রুমে ঢুকলাম, সেই সঙ্গে কাচি। কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললাম শাড়িটা।

স্কুল ছেড়ে কলেজ, কলেজ ছেড়ে ইউনিভার্সিটি এবং সেটাও শেষ করে চাকরিতে ঢুকলাম। এর মধ্যে মাঝে মাঝে শাড়ি পরেছি। পহেলা বৈশাখে লালপেড়ে শাদা শাড়ি, পহেলা ফাল্গুনে কাচা হলুদ রঙ–এর শাড়ি। এরপর এনগেজমেন্টের সময় সমুদ্রের মতো নীল শাড়ি, হলুদের সময় সর্ষে ফুলের মতো হলুদ রঙের শাড়ি, বিয়ের সময় টকটকে লাল শাড়ি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের মন্তব্য শুনেছি।

কেউ বলেছে জলপরীর মতো লাগছে, কেউ বা বলেছে হলুদ পাখি, কখনো কেউ বলেছে লাল টুকটুকে আপেল। মন্তব্যগুলো শুনে খুশি হয়েছি।

শাড়িগুলো যত্ন করে তুলে রেখেছি আলমারিতে। কিন্তু কোনো শাড়িই সেই শাড়িটার মতো প্রিয় হয়নি আমার। সেই লাল, নীল, হলুদ, কালো চেক শাড়িটার মতো। ওই শাড়িটা তো সাধারণ কোনো

সুতায় বোনা ছিল না। এটা তৈরি হয়েছিল আমার মায়ের গাঢ় মমতা এবং বাবার ভালোবাসা দিয়ে যেটা পরলেই অনুভব করতাম বাবা–মায়ের অসীম আদর।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

সাজ

– শীলা

যখন প্রেম করতাম, কতোভাবে সাজতাম ওর জন্য নিজেকে। সাজের দিকে তেমন আগ্রহ ছিল না বলেই এ বিষয়ে তেমন কোনো আলাপ জমে উঠতো না। যেদিন শাড়ি পরতাম, জানতে চাইলে শুধু বলতো, তুমি সুন্দর, নির্মল, শান্ত, সৌম্য, কতো কি! সাজ দিয়ে কি হবে?

ও এখন আমার স্বামী। স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের সম্পর্কের মাঝে নতুন মাত্রাও যোগ হয়েছে। এখনো প্রেম করেই যাচ্ছি। শুধু সময়ের কোনো স্বল্পতা নেই। আমি কেমন করে সাজবো তা নিয়ে স্বামী এখন অনেক ভাবে। ও চায়, আমি সব সময়ই শাড়ি পরে থাকি। আমি জানি অন্যদের চেয়ে আমার স্বামীর ভাবনাগুলো একটু আলাদা। কোনো অনুষ্ঠানে কিংবা নিমন্ত্রণে যেখানে সাধারণত শাড়ি পরেই সবাই যায় সেখানে আমাকে অন্য কিছু পরতে হয়। ও বলে, শাড়ির সাজ নাকি শুধুই ওর জন্য। তাই ঘরে যতোক্ষণ থাকি এবং আমরা দুজন শুধু যখন বেড়াতে যাই তখন আমাকে শাড়িই পরে থাকতে হয়। আমার এ সাজের দিকে খুব লক্ষ্য রাখে। এই তো কোন শাড়িটা পরবো, সঙ্গে পেটিকোট, ব্লাউজ, টিপ, চুল এবং ফুল সবই ওর পছন্দের। ওর রুচিও খুব চমৎকার।

কুচি করে শাড়ি পরতে ও আমাকে দেয় না। সব সময় এক প্যাচ করেই শাড়ি পরতে হয়। আর বিশেষ সময়ের যে সাজ তা নিয়ে কি আর বলবো। শাড়িটা হওয়া চাই ফ্রেশ। অনেক সময় ধরে সাজতে হয় আমাকে। ও অবশ্য সাহায্য করে। এক সময় কোথায় হারিয়ে যায় সে সাজ। কিন্তু ভোরে প্রয়োজনীয় স্নানটা সেরে শাড়ি পরে কাচা ফুলের তাজা সুবাস নিয়ে আলতো চুমুতে ওর চোখের ঘুমটা আমাকেই সরিয়ে দিতে হয়। নয়তো অফিস মিস করবে। কিন্তু ছুটির সকালটাতে আর তা হয় না। দিনের প্রায় সময়টাই চলে যায় শুধু শাড়ি, পেটিকোট চেঞ্জ করতে করতে।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন

পশ্চিম নাখালপাড়া, ঢাকা থেকে

শেখ হাসিনার শাড়ি

– অথই নূরুল আমিন

এক অক্টোবর ২০০১–এ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন বিটিভিতে এবং ইটিভিতে দেখানো হলো বিভিন্ন জাতীয় নেতানেত্রীর ভোট দেয়ার খবর। তাতে দেখানো হলো আমার নেত্রী যিনি বর্তমানে বিরোধী দলীয় নেত্রী ভোট দেয়ার সময় তার পরনে যে শাড়িটি ছিল তাতে ছিল *নৌকা* মার্কার ছাপ দেয়া।

তা দেখে এক মহিলা বললেন, দেহেন ভাবী, দেহেন, হাসিনার পরনে শাড়িটা কতো সুন্দর দেহায়।
একজন নেতা বিকাল প্রায় তিনটার সময় আমাকে বললেন, নেত্রীর পরনে আজ যে শাড়িটি সেটা দেখো। এবার আমরা পাস করলে এমন একটা শাড়ি কিনে তোমার ভাবীকে দেবো।
এদিকে আরেকটি গুঞ্জন উঠেছিল, এবার যে কোনো লেবাসই দেখানো হোক না কেন আর কাম হইবো না। নৌকা মার্কায় আর ভোট দিমু না।
ওই সব কথা উঠেছিল নেত্রীর পরনের ওই ব্যতিক্রমী শাড়ি দেখে।
সে যাহোক, আমি আওয়ামীমনা। কিন্তু আওয়ামী লীগ সমর্থনকারী অনেকের কথা ছিল, *আর নৌকায় ভোট দিুম না।*
তাতে বুঝেছিলাম ওরা আগে বহুবার নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছিল। কিন্তু এবার দেবে না।
এতে কষ্ট পাইনি। কেননা আওয়ামী সরকার পাচ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে জেলায় দশ, থানায় পাচ ও ইউনিয়নে দুইজন করে বেসামালভাবে ফায়দা লুটে নিয়েছে। তার দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে অগণিত আওয়ামীভক্তরা পেয়েছে অবহেলা, হয়েছে লাঞ্ছিত। এ কথাগুলো শুধু শাড়ি বিষয় লিখতে গিয়ে এসে পড়লো। পাঠকরা মাফ করবেন।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে

মাদকতা

– যাকিয়া সাঈদ

শাড়ি আমার সবচেয়ে প্রিয় পোশাক। সেই অল্প বয়স থেকেই শাড়ির প্রতি আকর্ষণ আমার দুর্নিবার। ক্লাস টেন–এ থাকতেই অর্থাৎ ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই রফত করে ফেললাম শাড়ি পরা। মাকে বুঝিয়ে, মানিয়ে, তার উলি জর্জেট শাড়িগুলো পরা শুরু করলাম। সময় গড়িয়ে চললো। স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ ছেড়ে ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তো শুধু শাড়ি আর শাড়ি। ততোদিনে বেশ কয়েকটি শাড়ি জমেছে আমার। সবই সুতি। সুতির শাড়ি আমার খুব পছন্দের। কারণ আমার মনে হয় সুতি শাড়িতে একজন রুচিসম্পন্ন, শিক্ষিত নারীর ব্যক্তিত্ব খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।
এই মতবাদে বিশ্বাস করে সব সময়ই সুতি শাড়ি পরতাম। হঠাৎ করেই একদিন জীবনে সূর্যের প্রবেশ। সূর্যের আগমন আমার জীবনে অনেকটা ধূমকেতুর মতো। তাকে ঠিক বুঝে ওঠার আগেই আমাকে সে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেললো। বুঝতে না বুঝতেই হারিয়ে গেলাম তার উন্মাতাল ভালোবাসায়। আমার সূর্য একটা পাগল।
তাকে অনেক দিন বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, আমাদের এই অসম ভালোবাসা আমার জীবনে যতোই শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিক অন্তত তার জীবনে কোনো সুফল বয়ে আনবে না, বরং সমস্যা সৃষ্টি করবে অনেক অনেক বেশি। কিন্তু কে শোনে কার কথা! পাগলটা আমার কথা কান দিয়ে শুনবে। তবে মন দিয়ে বুঝবে না। যদি বলি আমি তার থেকে বয়সে বড়, আমি বুড়ি হয়ে গেছি। সে বলবে, তুমি বুড়ি তো আমি বুড়ো, দেখো না চুলে কেমন পাক ধরেছে।

আমি জানি তার অসীম হৃদয়টা ভালোবাসার কাঙাল, সেখানে বয়সের ভেদাভেদটা কোনো ব্যাপারই নয়। তবুও আমার ভয় এ সমাজকে নিয়ে যে সমাজ কারো কোনো ত্রুটি–বিচ্যুতি ক্ষমা করে না।

প্রথম দিকে আমার সুতি শাড়ি পরা নিয়ে ও কিছু বলতো না। তাছাড়া ওই পাগলের চোখে তো আমি বিশ্ব সুন্দরী! কোথায় ঐশ্বরিয়া রায় আর কোথায় সুস্মিতা সেন! হঠাৎ একদিন কি কারণেই যেন জর্জেট শাড়ি পরে রুম থেকে বের হয়েছি। ডাইনিং টেবিলে বসা ছিল সূর্য। অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলো, বাহ, বুড়ি বাহ! তার সপ্রশংস দৃষ্টিতে আরো কিছু ছিল।

লজ্জায় আরক্ত আমি তার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে গেলাম। হলুদ ক্যাব নিয়ে ছুটলাম গন্তব্যে। সে সারাটা পথ আমার দিকে ফিরে বসে রইলো তার একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে। ডান হাতের মুঠো গালে ঠেকিয়ে, অন্য হাতটা ভাজ করে ডান হাতের কনুই ধরে। যতোবার হাত দিয়ে তার চোখ ঢাকতে যাই, হাত সরিয়ে বলে, বাহ, বুড়ি বাহ!

বাড়ি ফিরতেই সূর্যের অর্ডার, এখন থেকে শুধু জর্জেট পরবে তুমি।

পাগলের কথায় হাসবো, না কাদবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। মনে মনে যে একটু খুশি হইনি তা বলবো না। তবে মনের ভাবটা চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, শুধু জর্জেট কেন?

সুতি শাড়িগুলোর তাহলে কি হবে? তাছাড়া সুতি শাড়ি আমার ভালো লাগে।

সে বললো, সুতি তুমি পরতে পারো। তবে আমার সামনে নয়।

তখন জর্জেটের জয় জয়কার!

বললাম, কখনো না!

হেসে বললো, ঠিক আছে, দেখা যাবে।

তার আত্মপ্রত্যয়ী হাসি দেখে বুঝেছিলাম একদিন ঠিক তাই হবে যা সে চাইবে। কারণ...। যাক কারণটা উহ্যই থাক।

এরপর থেকেই শাড়ি কেনার কথা শুনলেই সে ছেলেমানুষের মতো জেদ ধরে যে, আমাকে জর্জেট শাড়িই কিনতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কেন যেন মনে হতে থাকলো যে, আসলেই জর্জেট শাড়িতে আমাকে বেশ ভালো দেখায়। নিজেকে আহা মরি সুন্দরী মনে করা দূরে থাক, সাধারণ সুন্দরীও মনে করিনি কখনো। তবে ছিমছাম সাজ আর মিষ্টি হাসির প্রশংসা বরাবরই পেয়ে এসেছি। নিজেকে এর চেয়ে বেশি কিছু মনে করার প্রয়োজন মনে করিনি কখনো। কিন্তু সূর্যের চোখ, তার অভিব্যক্তি এবং প্রশংসা বুঝি বা আমার মনকেও করে তুলেছে কিছুটা আত্মবিশ্বাসী। তাই যে আমি সুতি শাড়িতে ছিলাম আজীবন অভ্যস্ত। হঠাৎ করেই জর্জেট শাড়ি পরা শুরু করলাম কিছুটা জ্ঞান, কিছুটা নিজের অজান্তেই। ভালোবাসার কাছে, ভালোবাসার মানুষের কাছে, তার পছন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করা, তার ভালোবাসার রঙ–এ বিলীন হয়ে যাওয়া এটাও ভালোবাসারই আরেক রূপ, এ হচ্ছে তার প্রতি আমার ভালোবাসা।

আমার জর্জেটপ্রীতি দেখে এখন সূর্য হাসে, শুধু হাসে। সে আমাকে দোকানে নিয়ে যায়। জর্জেট কিনে দেয়। বলে, মনে করো, এটা আমি, তোমার সর্বাঙ্গে আলতো করে জড়িয়ে আছি।

তার দৃষ্টির মুগ্ধতা, তার স্পর্শের মাদকতা আরো বেশি করে অনুভব করি যখন তার প্রিয় রঙ–এর জর্জেটগুলো পরি। মনে হয় যেন আমার পেলব কোমল শরীরের প্রতিটি অংশে তার ছোয়া লেগে

আছে। আমি আপাদমস্তক শিহরিত হই, এক অনির্বচনীয় রঙিন সুখ ঘিরে রাখে আমাকে। এবং অস্ফুট স্বরে বলি, শুধু বলতেই থাকি, সূর্য, আমি তোমাকে খু–উ–ব ভালোবাসি।

বনানী, ঢাকা থেকে

লোডশেডিংয়ে

– এ কে এম সালাহউদ্দিন লিটন

আমি তখন ক্লাস থৃ–তে পড়ি। গ্রীষ্মে দাবদাহ এবং আকস্মিক ঝড়–বৃষ্টি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। চুলা জ্বালানোর জন্য নোন্দা (এক প্রকার জ্বালানি যা সুগার মিলের পরিত্যক্ত মণ্ড থেকে তৈরি করা হয়) ঘরের মধ্যে রাখা হয়েছে। লোডশেডিংয়ের কারণে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে বিদ্যুৎ বন্ধ থাকতো।
যথারীতি সেদিন সন্ধ্যাতেও বিদ্যুৎ চলে গেলে মা অন্য ঘরে প্রতিবেশী মহিলাদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। এ সময় সাহস করে কেরোসিনের বাতি ধরানোর জন্য ম্যাচ জ্বালাই। কিন্তু বিধি বাম। বাতির আগুন ঘরে শুকোতে দেয়া মায়ের শাড়িতে ধরে যায়। হতবাক হয়ে মা মা বলে চিৎকার শুরু করি। মা বিপদের আশংকায় দৌড়ে এসে দেখেন শাড়ি পুড়ে শেষ। পাশে আমি ভয়ে জড়সড়ো। দ্রুত পানি দিয়ে আগুন নেভানো হলো। আরেকটু হলেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতো।
চোখের সামনে মায়ের শাড়ি পুড়ে গেল আর আমি কিছুই করতে পারলাম না বলে কাদছি। অন্যদিকে মা আমাকে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কেদে চলেছেন এবং বলছেন, আল্লাহ, তুমি আমার মানিককে বাচিয়ে দিয়েছো। আমার কলিজার টুকরোকে রক্ষা করেছো। সেদিন না বুঝলেও বড় হয়ে বুঝেছি মায়ের কাছে শাড়ির থেকে আমার মূল্য ছিল অনেক বেশি।

ইসলামপুর, কাজলা, রাজশাহী থেকে

প্রদীপ

– অরুণ ভাস্কর

১৯৬৮ সালে আমার মায়ের কোল জুড়ে আমাদের আরেকটি ভাই এলো। ভাইটি আমার বাবা মায়ের তৃতীয় সন্তান। তিনটি ছেলে সন্তানের মধ্যে সেই সবচেয়ে ফর্শা ও স্বাস্থ্যবান হয়ে জন্ম নিয়েছে। বাবা খুশি হয়ে তার নাম রাখলেন নন্দ। অর্থাৎ আদরের দুলাল। ঘর আলো করে এলো বলে ভালো নাম রাখলেন প্রদীপ। এ খুশিতে মাকে কি দেয়া যায় ভেবে তখনকার সবচেয়ে দামি শাড়ি কিনে আনলেন পচিশ টাকা দিয়ে।
মা তখন আতুর ঘরে। হিন্দুদের প্রথা মতে, বাড়ির উঠানে এ ধরনের ঘর সন্তান জন্মের পর রাখা হয় অনেকটা অশুচি ও বহুবিধ প্রসবকালীন রোগ–ব্যাধি থেকে আলাদা রাখার জন্য বা মুক্ত রাখার জন্য। বাবা দাদুর বাড়ি এলেন। তখন আমি আতুর ঘরে মায়ের শুশ্রূষায় ব্যস্ত। বাবা ওই ঘরের দরজার মুখে

বসে ভোরের আলোয় ভাইয়ের মুখ দেখে ওই শাড়িটি মাকে উপহার দিলেন। সেদিন এতো দামি শাড়ি পেয়ে মায়ের মুখে যে আনন্দের উজ্জ্বলধারা বয়েছিল সে মুখটি এখনো আমার মনে আছে।

১৯৭১ সালে ভাইটিকে আমার দাদু কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে নিয়ে যাবার পর পরই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আমরা ভারতে চলে যাই। আড়াই বছরের ভাইটির জন্য মাকে নয়টি মাস চোখের জল ফেলতে দেখেছি। মাঝে মাঝে ভাইকে মনে করে, শাড়িটি বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছি। সেই শাড়িটি মা এখনো যত্ন করে রেখেছেন। আর ভাইটি কুলাউড়ার শিলুয়া চা বাগানে বাবুর চাকরি করছে। মা ওখানেই আছেন।

মুকুন্দবাড়ি, জামালপুর থেকে

বিশ্বাসের ঘরে আগুন

– মোহাম্মদ বজলুর রশীদ

বিশ্বাসের ঘরে আগুন লাগলে তা আর কখনো নেভার নয়। শাড়ির রঙয়ের বিড়ম্বনায় সৎ সাজতে গিয়ে এমনি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায় আমার জীবনে। যা এখনো আমাদের দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস–অবিশ্বাসের নিক্তিতে দোল খাচ্ছে।

১৯৯৮ সালের কথা। পেটের দায়ে কর্ম জীবনে কখন কোন দিকে ছুটতে হয় তার কোনো ঠিক–ঠিকানা নেই। আজ হয়তো এ জেলায়, কাল সে জেলায় এমননি করেই আমার চাকরি জীবন। মাঝে মাঝে দুই তিন দিন বাড়ি থেকে অনুপস্থিত। আবার টুর থেকে বাড়ি ফেরারও ছিল না কোনো নির্দিষ্ট সময়। সেদিন অফিসের কাজে টাঙ্গাইল থেকে এসে টঙ্গী নেমে কিছু বাজার করেছি। রিকশাযোগে উত্তরায় বাসায়। পাচ তলা বিল্ডিংয়ের দোতলায় আমরা থাকি। গেটে বহু দিনের পুরনো বিশ্বস্ত দারোয়ান।

রিকশার পাট চুকিয়ে বাজার নিয়ে দোতলায় উঠেই দেখি গেটের দরজা খোলা। ভাবলাম, কাজের মেয়েটা কাপড় নিয়ে হয়তো এই মাত্র ছাদে গিয়েছে। বাজার রান্না ঘরে নিয়ে দেখি স্ত্রী নেই। আস্তে আস্তে এ ঘর, সে ঘর উকি দিয়ে দেখি, স্ত্রী বেডরুমে টুটুলের পাশে চোখ বুজে আছে। ভাবলাম সে যখন আমার আসা টের পায়নি তাহলে তাকে একটা সারপ্রাইজ দেবো। চিন্তা অনুসারেই কাজ এগোচ্ছে। আমি চুপি চুপি পা টিপে আস্তে আস্তে খাটের কাছে গিয়ে বসেছি। স্ত্রী পেছন দিক থেকে আস্তে আস্তে হাতটা যেই মাত্র বুকের ওপর রেখেছি সে আমার হাতটা চেপে ধরেই এপিঠ হতেই আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। এ যেন মৌচাকে ঢিল ছুড়েছি। এতো আমার স্ত্রী নয়, টুটুলের পাশে শোয়া স্ত্রীর বান্ধবী। আমি কিছু বোঝার আগেই গালে এক চড় পড়েছে। সঙ্গে, *অসভ্য জানোয়ার...।* সে যে শাড়ি পরে শুয়ে আছে হুবহু এ রকম একটা শাড়ি আমার স্ত্রীরও আছে। তার রঙও একই রকম।

আসলে উত্তরার তিন নাম্বার সেক্টরে আমার স্ত্রীর এক বান্ধবী আছে। সে মাঝে মাঝে এ বাসায় বেড়াতে আসে। আবার তার গায়ের গড়নও প্রায় আমার স্ত্রীর মতোই। রঙ–রুচিতেও তাদের মাঝে অনেক মিল। টুটুলের পাশে একই রঙয়ের শাড়ি পরে শুয়ে থাকা আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেই বা হবে।

সত্যি নিজের স্ত্রী ভেবে তাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য যা ঘটলো তাতে শুধু সারপ্রাইজই হলাম না, লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। তার উপর চপেটাঘাতে আমার গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। আমার স্ত্রী কতোদিনই না তার বান্ধবীর কাছে আমার ব্যাপারে গর্ব করেছে। আজ সব ভূলুণ্ঠিত।
ছাদে কাপড় দিয়ে বাসায় এসে দেখে তার প্রিয় বান্ধবীর চোখে জল ও মুখমণ্ডল লাল। সে তো তাকে এ অবস্থায় রেখে ছাদে যায়নি। তাহলে এতো অল্প সময়ে এমন কি হলো? সেও বুঝে উঠতে পারেনি। তাকে কিছু বলার আগেই স্ত্রীর সামনে শুধু *অসভ্য জানোয়ার* বলে খোলা দরজা দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে বের হয়ে গেল।
তার বান্ধবীটি আর কখনো এ বাসায় পা বাড়ায়নি। স্ত্রীকেও বহুবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি এ শুধু শাড়ির রঙয়ের বিড়ম্বনা। এটা আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল। স্ত্রীর কাছে তাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরানোর আমি শুধু আসামিই নই, চরিত্রহীনও বটে।

লিবিয়া থেকে

ত্রিমাত্রিক

– গাজী মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন

এক.
ঢাকায় এসে এলএলবি–তে ভর্তি হয়েছি। ক্লাস হয় সন্ধ্যার সময়। সারা দিন অফুরন্ত সময়। চেষ্টা করতে লাগলাম সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য। শুরু করলাম টিউশনি। টিউশনির প্রথম মাসের বেতন পাওয়ার পর চিন্তা করছি এ টাকা দিয়ে কি করবো। কারণ আমার সার্বিক খরচ মা–বাবাই দেন। তাছাড়া ওইটা ছিল আমার প্রথম আয়। সিদ্ধান্ত নিলাম এ টাকা দিয়ে মাকে একটা শাড়ি কিনে দেবো। জানি না আমার দেয়া শাড়ি মায়ের কেমন লেগেছিল। তবে আমি যখন মাকে শাড়িটা দিলাম তার তখনকার আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। আমার মা স্বর্গ হাতে পেলেও মনে হয় এতো খুশি হতেন না। এটাই ছিল আমার কেনা প্রথম শাড়ি।
দুই.
বিয়ের পর থেকে আমার বোন আমেরিকা প্রবাসী। একবার আমাকে সে জানালো, তাকে জামদানি শাড়ি কিনে পাঠাতে হবে। আমি তখনো পর্যন্ত জানি না জামদানি শাড়ি কেমন এবং কোথায় ভালো জামদানি শাড়ি পাওয়া যায়। আমার এক ভাবীর কাছে গেলাম। ভাবী আমাকে একটা জামদানি শাড়ি দেখালেন এবং বললেন, ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট অর্থাৎ ঢাকা কলেজের সামনের মার্কেটে অনেক জামদানি শাড়ির দোকান আছে। আমি ও আমার বন্ধু মিলে জামদানি শাড়ি কিনতে গেলাম। কয়েকটা দোকান ঘুরে একটা শাড়ি পছন্দ করলাম। যার দাম চাইলো ছয় হাজার পাচশ টাকা। আমরা দুই বন্ধু আলোচনা করে দাম বললাম, তিন হাজার পাচশ টাকা। অবশেষে তিন হাজার সাতশ টাকায় শাড়িটা কিনলাম। শাড়িটা যখন ওই ভাবীকে দেখালাম, ভাবী বললেন, শাড়িটা সুন্দর। তবে এগুলোর দাম দুই হাজার দুইশ থেকে দুই হাজার পাচশ টাকার মধ্যে। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাতে এভাবে ধরা খেলাম।

তিন.

ঢাকায় আসার পর আমার মরুময় জীবনে মরুদ্যানের আবির্ভাব ঘটলো অর্থাৎ প্রেমে পড়লাম। ইতিমধ্যে প্রেমের বয়স আট মাস অতিবাহিত হয়েছে। সামনে প্রেমিকার জন্মদিন। জন্মদিনে তাকে একটা শাড়ি উপহার দেবো সিদ্ধান্ত নিলাম। যথাসময়ে শাড়ি কিনতে মার্কেটে গেলাম। অনেক ঘুরে এবং অনেক দেখেও তার জন্য শাড়ি পছন্দ করতে পারলাম না। আমি সিদ্ধান্তহীনতায় পড়লাম। কোনটা তার জন্য কিনবো। আমার কেনাটা যদি তার পছন্দ না হয়! ইতিপূর্বে মা ও বোনের শাড়ি কিনেছি। কিন্তু এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হইনি। প্রিয়ার শাড়ি কিনতে গিয়ে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাসটা রাখতে পারলাম না। তাই পরবর্তী দিনে তাকে সঙ্গে নিয়েই মার্কেটে গেলাম তার শাড়ি কেনার জন্য। এভাবেই প্রিয়াকে তার প্রথম উপহারটা দিলাম।

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম থেকে

একদা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড

–সিমিন আহমেদ

শাড়ি শব্দটা আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর সেই ঘটনাটি। আজ থেকে সাত বছর আগের কথা।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির কলা ভবনের যশস্বী ডিপার্টমেন্ট। ততোধিক যশস্বী সহযোগী অধ্যাপক। কবি খ্যাতি আছে তার। ঝাকড়া ফুলে থাকা চুল। চলনে–বলনে ঈষৎ উদাস উদাস ভাব। যাহোক, আমার বান্ধবী তাই নাম প্রকাশ করছি না। সে এখন নামি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সে তখন সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। স্যারের দুটো টিউটোরিয়াল পরীক্ষা মিস করেছে অসুস্থতার জন্য। আমি অন্য স্যারের টিউটোরিয়াল গ্রুপে ছিলাম।

বান্ধবীকে বললাম, তুই গিয়ে সরাসরি স্যারের সঙ্গে বথা বল। বান্ধবীর ভয় তবু যায় না। স্যার খুবই মুডি – এই মেঘলা, এই রৌদ্রোজ্জ্বল।

এখানে বলে রাখি, আমার বান্ধবী খুবই স্মার্ট ও আকর্ষণীয় ফিগারের অধিকারী। মাঝারি টাইপের সুন্দরী।

স্যারের কাছে গিয়ে এক বুক সাহস নিয়ে বান্ধবী জানালো সব। গম্ভীর মুখে স্যার শুনলেন সব। গাঢ় চোখে দুই তিনবার তাকালেন বান্ধবীর দিকে। বললেন, ঠিক আছে, সামনের মঙ্গলবার এসো সকাল সাড়ে নয়টায়। বান্ধবীর হাপ ছেড়ে বাচার পালা। থ্যাংক ইউ দিতে গেল।

তার আগেই গাঢ় কণ্ঠে স্যার বললেন, শাড়ি পরে এসো। বান্ধবী প্রথমে বুঝতে পারলো না। স্যার এবার একটু উদাস কণ্ঠে বললেন, ওই দিন শাড়ি পরে এসো...।

আচ্ছা বলুন তো তারপর কি হলো? বান্ধবী ছিঃ, ছিঃ করে বেরিয়ে এলো, নাকি স্যারকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিল?

কোনোটাই নয়। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টায় সিল্কের চমৎকার একটা শাড়ি পরে এসে সে ঢুকলো স্যারের রুমে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা দিতে। করিডোরে তেমন কেউ ছিল না। সব ক্লাস রুমগুলোতে লেকচার চলছিল।

রুমে ঢুকে বান্ধবী রহস্যময় মিষ্টি হাসি দিল। স্যার উঠে এসে দরজা লাগিয়ে দিলেন উদাসী ভঙ্গীতেই। বান্ধবী নিশ্চয়ই অসাধারণ পরীক্ষা দিয়েছিল। আফটার অল সিল্কের শাড়ি।

হায় শাড়ি!

হায় শিক্ষক!

হায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি!

হায় একদা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড...

মগবাজার, ঢাকা থেকে

শাড়ি চক্র

– রেশমা মজুমদার শম্পা

শাড়ি, শাড়ি আর শাড়ি। শাড়ি পেতে এবং প্রিয়জনকে শাড়ি দিতে এতো যে আনন্দিত হই অন্য কোনো ভালোলাগার সঙ্গে তার তুলনা করা যাবে না। পুতুল খেলার সোনালি দিনগুলোতে আম্মার শাড়ি জড়িয়ে শাড়ির প্রতি যে মমতা তৈরি হয়েছিল জীবনের এই দুপুরে এসেও শাড়ির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কমতি তো নেই, বরং বেড়েই চলেছে। বাঙালি মেয়ের প্রতিদিনে শাড়ির ভূমিকা চিরায়ত এবং অনিবার্য।

কিশোরী বেলায় আম্মার শতেক শাড়ির দিকে প্রায়ই তৃষ্ণিত নয়নে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম, এ রকম অনেক শাড়ি কবে আমার হবে! ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ আব্বা আমাকে অবাক করে দিয়ে বারো বছরের জন্মদিনে একটি সবুজ জামদানি উপহার দিয়েছিলেন। প্রথম শাড়ি উপহার। স্কুল পেরিয়ে কলেজে উঠেছি যখন, শাড়ি পরার ইচ্ছাটা আরো তীব্র হয়েছে। বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের ইউনিফর্ম ছিল শাদা সালোয়ার-কামিজ অথবা শাদা শাড়ি। বাসায় শাদা শাড়ির কথাই বললাম। তারপর আর কি? ইচ্ছে মতো রোজ শাড়ি পরে কলেজ করা। শাদা? তাতে কি? শাড়ি তো!

সেটা আমার ইন্টার্নি করার বছর। ময়মনসিংহ মেডিকাল কলেজে ট্রেনিং চলছে। দুদিনের ছুটিতে ঢাকার বাসায় এসেছি। ফেরার দিন তৈরি হচ্ছি। আম্মা হঠাৎ একটি জরিপাড় ময়ূরকণ্ঠি নতুন মচমচে টাঙ্গাইল শাড়ি বের করে দিলেন এবং তখনি পরে তৈরি হয়ে নিতে বললেন। যদিও খুবই সন্দিহান এবং অবাক হলাম তবুও নতুন শাড়ি পাওয়ার আনন্দে সাত পাচ বিচার না করে মনের আনন্দে অতি যত্নে শাড়িটি পরলাম।

তারপরের কাহিনী নতুন জীবনের। সেই টাঙ্গাইল শাড়িতে আমাকে দেখে আমার প্রিয়তম স্বামীটি নাকি তখনি কুপোকাত হয়েছিলেন। এতে নাকি আমার চেয়ে টাঙ্গাইল শাড়ির কৃতিত্বটাই বেশি ছিল।

আম্মার আলমারি ভর্তি ছিল দেশ–বিদেশের নানান শাড়ি সংগ্রহ। খুব ছোটবেলা থেকেই আম্মার শাড়ির প্রতি ভীষণ আকর্ষণ বোধ করতাম। নিজে যখন শাড়ির মালিক হলাম তখনো আম্মার শাড়ির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারিনি। কিন্তু আম্মা তার শাড়ির প্রতি ছিলেন অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, কিছুতেই ইচ্ছা মতো পরতে পেতাম না।

আজ সেসব শাড়ি পরতে আর কোনো বাধা নেই। তবুও কেন যেন পরতে পারি না। শাড়িগুলো তেমনই আছে আম্মার সুবাস নিয়ে। আম্মাই চিরদিনের চোখের আড়াল হয়েছেন। সোনালি–হলুদে মেশানো শ্যামজ সাটিন শাড়িটি যেদিনই পরেছি, বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়–স্বজন সবাই এক নজর তাকিয়েছে আর শাড়িটির প্রশংসা করেছে। আমি কেবল নিঃশ্বাস ফেলেছি। ছোট মেয়ে হওয়া উপলক্ষে খুব ভালোবাসে, খুশি হয়ে আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধু পরমাত্মীয় ডা. জাকিয়া শাড়িটি আমাকে দিয়েছিলেন। শাড়িটি একটুও মলিন হয়নি। জাকুই হারিয়ে গেছেন অসীম শূন্যে।

এক একটি শাড়ি যেন জীবনের এক একটি কাহিনী। প্রত্যেকটির গায়েই জড়িয়ে আছে স্মৃতির সোনালি ধুলো, কোনোটা বা কষ্টের, কোনোটা বা আনন্দের। সেই যে প্রথম শাড়ি পরার দিনটি থেকে শাড়ির প্রতি তীব্র টানের সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ বেড়ে বহুগুণ হয়েছে। একটু মনে ধরলেই হলো, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কিনে ফেলা আর তার জের সামলাতে অন্যদিকে ব্যয় সংকোচন।

জীবনচক্রের মতোই ঘুরে ঘুরে এই শাড়ি চক্রে একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখি যখন আমার ছোট মেয়ে আমার শাড়ি জড়িয়ে পুতুল খেলতে বসে। অথবা তেরো বছরের বড় মেয়ে যখন পহেলা বৈশাখে একেবারে নিজের করে পাওয়া শাড়ি পরতে চায়।

আমরা বাঙালি মেয়েরা এই শাড়ি চক্রের আবর্তেই ঘুরছি পৃথিবী এগিয়ে যাক না যতোটা পারে, মেয়েরাও এগিয়ে যাক। তবু বাঙালি মেয়ের শাড়ির প্রতি চিরন্তন মমতার কখনোই কমতি ঘটবে না অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

আসল রূপ

– সুমী

শাড়িতে নাকি বাঙালি মেয়েদের আসল রূপ ফুটে ওঠে। ছোটবেলা খেলার ছলে মায়ের শাড়ি পেচিয়ে পরেছি কি না ঠিক মনে নেই। তবে এটা স্পষ্ট মনে দাগ কেটে আছে যে, টিনএজ বয়সে প্রথম সেদিন ঘটা করে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন আমার বড় বোন। উদ্দেশ্য ছবি তোলা। বাড়িতে অনেক মানুষের সামনে প্রথম শাড়ি পরে যেতে লজ্জা করছিল ঠিকই তবে নিজেকে আয়নায় খুটিয়ে দেখার ইচ্ছাটা কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিলাম না।

ছবি তোলার পর্ব শেষ হলে চুরি করে আয়নায় নিজেকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে আবিষ্কার করি। কখনো আচল টেনে, কখনো পিনআপ করে, কখনো বা বধূর মতো মাথায় ঘোমটা দিয়ে। সেই থেকেই শাড়ি পরার প্রতি আমার প্রচণ্ড রকম দুর্বলতা। সময়ের প্রেক্ষিতে এখন বিভিন্ন অকেশনে শাড়ি পরতে হচ্ছে।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, শাড়ি পরা অবস্থায় বিভিন্ন অকেশনে, পার্টিতে, প্রোগ্রামে অনেকের কাছ থেকে প্রেম ও বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। আমি দেখতে অতোটা সুন্দরী নই। তবে বন্ধুরা বলে শাড়িতে নাকি আমাকে দারুণ মানায়।

বাসায় যখন কেউ থাকে না সময়টা তখন একান্তই আমার। পরিপাটিভাবে শাড়ি পরে নিজেকে সাজিয়ে আয়নায় যখন দেখি তখন তার কথা খুব মনে পড়ে। পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে আমার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে শাড়ি পরে বেড়ানো হয়নি, কখনো তার সামনে যাওয়াও হয়নি শাড়ি পরে। আমার শাড়ি পরা ছবি দেখে সে রীতিমতো মুগ্ধ। অনেক দিন ধরে সে দেশের বাইরে।

আমার পড়াশোনার পর্ব শেষ হয়েছে। তারও আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। অপেক্ষা করছি সেই দিনটির যেদিন এয়ারপোর্টে তাকে রিসিভ করতে যাবো। নীল শাড়ি পরে সুন্দরভাবে সেজে তাকে চমকে দেবো। সেই শুভ দিনটির জন্য গুণছি প্রতীক্ষার প্রহর।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, চট্টগ্রাম থেকে

ম্যারেজ ডে

– নাসিমউর রহমান চঞ্চল

আমাকে ভাবী খুব ভালোবাসে। তার ভালোবাসার টানে আমিও ছুটে যাই বার বার। হঠাৎ ভাবীর ম্যারেজ ডে–র নিমন্ত্রণ পেলাম। ভাবীকে কি গিফট দেয়া যায় ভাবতে লাগলাম। পরিশেষে ভাবীকে একখানা শাড়ি গিফট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

শাড়ি কেনার অভিজ্ঞতা আমার কোনোকালেই ছিল না। অগত্যা ভাবীকে নিয়ে বের হলাম শাড়ি কেনার জন্য। অনেক খুজে শাড়ি পছন্দ হলো। হঠাৎ দোকানদার বলতে লাগলো, ভাই, আপনার ওয়াইফকে দারুণ মানিয়েছে শাড়িটা।

এ কথা শুনে ভাবী হয়তো লজ্জা পেলেন কিন্তু হাসতে লাগলেন।

যাক, সেদিনের মতো শাড়ি কিনে বাসায় পৌছালাম ভাবীকে নিয়ে। তার পরের দিন ভাবীর ম্যারেজ ডে। জাকজমকপূর্ণভাবেই দিনটা কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে, কে যেন গৃল ধরে আকাশের পানে চেয়ে রয়েছে, আমি তো ভাবী ভেবে গিয়ে দুহাতে জাপটে ধরলাম। কারণ আমার কেনা সেই শাড়িটা পরেই সে দাড়িয়ে ছিল। কিন্তু ধরার পর বুঝতে পারি, সে ভাবী নয়, ভাবীর ছোটবোন সিম্মী। আমার হাত দুটো তখনো সিম্মীকে জাপটে রেখেছে। ওর স্তনে আমার হাতখানা স্পর্শ করার পর কি এক অদ্ভুত শিহরণে দেহখানা পুলকিত হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে একটু দূরে দাড়িয়ে, আমার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলাম। সিম্মী হাসতে লাগলো।

আমার হাত দুটো ধরে সে বললো, কি ব্যাপার, মেয়েমানুষ দেখলেই বুঝি জাপটে ধরার ইচ্ছা হয়?

কি করবো বুঝতে না পেরে ওকে বললাম, ভাবীকে এ ঘটনাটা বলো না।

এক শর্তে আমি এটা না বলতে পারি যদি আমাকে তুমি ভালোবাসো এবং এ রকম জাপটে ধরে আদর করো।

সত্যি কথা বলতে কি, ওকে আমার আগে থেকেই ভালো লাগতো। কিন্তু কখনো বলার সাহস হয়নি। এখন আমরা দীর্ঘ দিন ধরে গভীর প্রেমে আচ্ছন্ন।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে

নক্ষত্রের রাত

– হিমালয়

১৯৯৬ সাল। আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী। টেস্ট পরীক্ষায় ভালো করেছি। এসএসসি–তেও ভালো করতে হবে। তাই বই পুস্তকের ওপর ঝাপিয়ে পড়লাম। কিন্তু সমস্যা তৈরি করছিল পাশের বাড়ির একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম রুমালি। যদিও রুমালি শব্দের অর্থ *কবুতর* তবুও মেয়েটির চাল–চলন ছিল বিড়ালের মতো। মাত্র ক্লাস সিক্সে পড়তো। শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে সে ছিল অনেকটা এগিয়ে। তাকে টিনএজ মেয়েদের মতোই লাগতো। আমাদের বাড়ির শাদা বিড়ালটি যেমন তার নরম শরীর দিয়ে আমার পায়ের কাছে ঘেষাঘেষি করতো ঠিক তেমনি রুমালি নানান অজুহাতে আমার কাছে আসতো। এবং আমার আদর নেয়ার চেষ্টা করতো। মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে বিড়ালটিকে লাথি মেরে দশ হাত দূরে ফেলে দিতাম।

রুমালিকে তো আর লাথি মারা যায় না। তবে তাকে ছেড়েও দিতাম না। সুযোগ পেলেই তার নরম শরীরে হাত বোলাতাম। একদিন অংক কষানোর অজুহাতে আমার কাছে এলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংক দাগিয়ে দিলাম। তারপর তাকে যেতে বললাম। সে যাচ্ছে না, তার চোখের দিকে তাকালাম। তার চোখে লেখা, আপনি আমাকে একটু আদর না করলে আমি এখান থেকে যাবো না। তাই কাছে টেনে নিলাম, আদর করলাম এবং জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। প্রথম চুমু। যদি কাউকে বলে দেয় তাহলে প্রেস্টিজ থাকবে না। তাই একটু ভয়ে থাকলাম তার পরের দিনটার জন্য। ভয় আরো বাড়লো যখন দেখলাম সে সারাদিনও আমার কাছে আসছে না। কিন্তু ভয়ের অবসান ঘটিয়ে পরের দিন রাতে সে আবার এলো একই সময়ে ইংরেজি বই হাতে নিয়ে। আরো সাহসী হলাম এবং সুযোগের সৎ ব্যবহার করলাম। এভাবে প্রতিদিনই চলতে থাকলো আমাদের ছোয়া ছোয়া খেলা।

একদিন সে হুট করে আমার পড়ার টেবিলে এসে একটা চিরকুট রেখে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। চিরকুটে লেখা, *প্রতিদিন শুধু আপনিই চুমু খাবেন। আমার কি ইচ্ছা করে না! আমিও খেতে চাই। কবে কখন আমাকে সুযোগ দেবেন জানাবেন।*

চিঠি পড়ে আমি তো হতবাক। বলে কি এই পিচ্চি মেয়ে! কয়েকদিন পর তার চিঠির উত্তরে লিখলাম, *এই মেয়ে, তুমি কি শাড়ি পরতে পারো? ছেলেদেরকে প্রথম চুমু খেতে হলে শাড়ি পরতে হয়। যদি শাড়ি পরতে পারো তবে আগামীকাল রাত নয়টার সময় আমার জানালায় তিনটা টোকা দেবে। তবেই আমি আসবো।*

তার পরের দিন ছিল সোমবার। টিভিতে রাত নয়টার সময় হুমায়ুন আহমেদ–এর জনপ্রিয় ধারাবাহিক *নক্ষত্রের রাত* প্রচারিত হবে। তখন সবাই টিভি দেখায় ব্যস্ত থাকবে বলে এই সময়টা আমরা বেছে

নিলাম। দুঃখের বিষয়, রাত ঠিক নয়টার দিকেই আমার এক খালোতো ভাই আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো এবং আমার ঘরেই সে ঢুকলো। ওইদিক দিয়ে জানালায় টোকা পড়ছে ঠিক মতোই। খালোতো ভাইয়ের কাছ থেকে দশ মিনিট সময় ধার নিয়ে বাইরে গেলাম এবং হলুদ শাড়ি পরা এক অপূর্ব রুমালিকে দেখে মুগ্ধ হলাম। তাকে নির্জন একটা জায়গায় নিয়ে বললাম, এই আমাকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। তোমার যেখানে খুশি তুমি চুমু খাও।

কিন্তু সে লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে রইলো। চলে আসতে চাইলাম, পেছন থেকে আমাকে টেনে ধরলো এবং আমার ঠোঁট, গাল, বুকে তার রঙিন ঠোঁট দিয়ে আলপনা একে দিল। আমিও তাকে আচ্ছা মতো চুমু খেলাম। তার ঠোঁট চুষতে থাকলাম। সে চরম উত্তেজনায় আমাকে জড়িয়ে ধরলো। তার শরীরে ওপরের অংশের শাড়ি, ব্লাউজ খুলে ফেললাম। প্রথম শাড়ি পরেছে, ব্রাও পরেনি। ফলে তার বুকের দুটি স্তন চাদের আলোয় নক্ষত্রের মতোই জ্বল জ্বল করছিল। আকাশ জুড়ে নক্ষত্রগুলো যেমন খেলা করছিল তেমনি তার স্তন দুটি নিয়ে খেলা শুরু করলাম।

তার উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌছালো। তার সব কিছু পেতে চাইলাম। কিন্তু সে বাধা দিল। চলে আসতে চাইলাম, সে আমাকে আসতেও দিচ্ছে না। বরং আমার মাথাটা তার খোলা বুকের কাছে চেপে রাখলো। প্রায় যুদ্ধ করে তার কাছ থেকে ছুটে এলাম। এসে দেখা গেল *নক্ষত্রের রাত* নাটকও শেষ হলো। অর্থাৎ পঞ্চাশ মিনিট তার কাছে ছিলাম।

এখন ২০০২ সাল। অনেক ঘটনা দুর্ঘটনার পর সে এবার এসএসসি দেবে। রুমালিও বই পুস্তকের ওপর ঝাপিয়ে পড়ছে। কিন্তু কোনো নক্ষত্রের রাতে এবার তার জানালায় তিন টোকা দিলাম। আগের কথামতো সে বেরিয়ে এলো। আমরা পুকুর পাড়ে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে বসলাম। আজকেও তার গায়ে টকটকে হলুদ শাড়ি। তার কোলে মাথা রাখলাম। সে আমার মাথায় হাত বোলালো, আদর করলো, চুমু খেলো। আমরা আবার মিলে একাকার হলাম। আমি তার সব কিছু চাইলাম।

সে বললো, আরেকদিন।

আমি আর একটি নক্ষত্রের রাতের অপেক্ষায় আছি। যেদিন রুমালি আবারও শাড়ি পরবে সেদিনই হবে আমার সৌভাগ্যের দিন।

ঢাকা থেকে

পত্রমিতা

– আরিফীন আবেদীন

রিমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় দুই বছর থেকে। প্রতি মাসে হাতেগোনা পনেরোটা চিঠির তার কাছ থেকে আমি পাই। এভাবে তার কাছ থেকে পাওয়া চিঠির সংখ্যা দাড়িয়েছে তিনশ ষাটটিতে। অবশ্য প্রাপ্তি স্বীকার স্বরূপ তাকেও এই পর্যন্ত তিনশ ষাটটিতে উত্তরই পাঠিয়েছি। আমাদের দুজনের ভালোবাসা যে কতোটা গভীর এ কথা লিখে বা মুখে বলে বোঝাতে পারবো না। ভালোবাসার

গভীরতা কখনো লিখে বা মুখে বলে বোঝানো যায় না। ভালোবাসার গভীরতা বুঝতে হয় হৃদয়ের হৃদ্যতা দিয়ে হয়তো বা এই কারণে!

অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সুদীর্ঘ দুই বছরের সম্পর্ক চলা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমরা একজন আরেকজনকে দেখিনি! কারণ আমাদের সম্পর্কটা হয়েছে পত্রমিতালীর মাধ্যমে। এবং এখন পর্যন্ত তাতেই সীমাবদ্ধ। অবশেষে চিঠির মাধ্যমে দুজনে সিদ্ধান্ত নিলাম সরাসরি একে অন্যকে দেখার এবং কথা বলার। অতঃপর তারিখ, সময় এবং স্থানও নির্ধারিত হলো।

পহেলা, এপৃল ২০০২। সকাল থেকেই খুব টেনশনে আছি। কারণ আজকেই রিমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হবে। কোন শার্টটা গায়ে দিলে বেশি মানাবে, কোন প্যান্টটা পরলে স্মার্ট মনে হবে এতো সব সাত–পাচ ভাবতে ভাবতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। তাই তাড়াহুড়ো করে কাপড় পরেই বেরিয়ে পড়লাম। চিঠিতে রিমার বর্ণনা অনুযায়ী বোটানিকাল গার্ডেনের পদ্মপুকুরের পাশে এসে উপস্থিত হলাম নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগেই। এরপর অপেক্ষা... শুধুই অপেক্ষা।

এভাবে সময় যাচ্ছে আর আমার তৃষ্ণার্ত দুই চোখ পদ্মপুকুরের চারপাশে খুজে বেড়াচ্ছে নীল শাড়ি পরুয়া আমার প্রথম ভালোবাসা রিমাকে। এভাবে অপেক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে হঠাৎ পদ্মপুকুরের উত্তর দিকে তাকাতেই বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠলো! কারণ নীল শাড়ি পরা পরীর মতো এক মেয়ে সেখানে একা বসে আছে। তাকে দেখা মাত্রই আমার শরীরে অন্য রকম এক শিহরণ জেগে উঠলো।

কালবিলম্ব না করে প্রায় দৌড়ে গিয়ে তার পাশে বসেই হাপাতে হাপাতে বললাম, তুমি নিশ্চয়ই রিমা। এতো দেরি করলে কেন? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি।

আমাকে অবাক করে দিয়ে সেই নীল শাড়ি পরিহিতা নীল পরী বললো, *ক্যাঠা আপনে? এই ছব কি কইবার লাগছেন? দেইখ্যা তো পাগলও মনে হইতাছে না। ওই ছব ভং ছাইড়া দ্যান। আমার সাথ ভি চলেন। রেইট বেশি না, একশ দিলেই চলবো।*

নীল পরীর কথাটি শেষ হতেই বুঝে গেলাম সে আমার রিমা নয়। আমি ভুল একজনের পাশে বসেছি। তাই উঠে দাড়িয়ে সামনের দিকে পা বাড়াতেই পেছন থেকে ডাক শুনতে পেলাম, দাড়াও আরিফ, আমিই রিমা! আজ পহেলা এপৃল। তাই তোমার সঙ্গে একটু জোক করছিলাম।

কথাটি বলেই আমার হাতে একটা সবুজ খাম ধরিয়ে দেয় সে যে খাম আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম মাত্র আট দিন আগে। খামটা হাতে নিয়ে আর স্থির থাকতে পারিনি। আমার সামনে দাড়িয়ে থাকা নীল পরীটাকে জড়িয়ে ধরি শক্ত হাতে।

সেনপাড়া পর্বত্য, মিরপুর, ঢাকা থেকে

শ্রদ্ধা

– লিসি চৌধুরী

আমার মায়ের কাছে প্রায়ই আমি একটা গল্প শুনতে চাই। সেটি হলো পাচ টাকার শাড়ির গল্প। বৃটিশ আমলে নাকি সবচেয়ে সূক্ষ্ম সুন্দর শাড়ির দাম ছিল মাত্র পাচ টাকা। এ যুগে এমন কিছু ভাবাই যায় না। পাচ টাকায় একটা ভালো রুমালও পাওয়া যাবে না আর বারো হাত শাড়ি!

পাকিস্তান আমলে আম্মারা নাকি সাত টাকার মিনা শাড়ি ঘরে পরার জন্য ব্যবহার করতেন। যদিও জানি, তখন টাকার দাম ছিল বেশি। হয়তো কর্তারা তখন বেতন পেতেন মাত্র ত্রিশ চল্লিশ টাকা। আমার আব্বা একটা সরকারি চাকরি করতেন। তখন তার বেতন ছিল মাত্র দুইশ টাকা।

এবার আম্মার একটা প্রিয় শাড়ি হারানোর কথা লিখবো। শাড়িটা আম্মাকে দিয়েছিলেন আমাদের পাশের বাসার চাচির আম্মা লন্ডন থেকে সেই উনি জর্জেট শাড়িটি আম্মার জন্য এনেছিলেন। শাড়ির রঙটা ছিল হালকা মিষ্টি কালার আর শাড়িটা ছিল খুবই স্মার্ট। শাড়িটা দেখিনি কিন্তু আম্মার কাছ থেকে গল্প শুনে একদম চেনা হয়ে গেছে। আমার সেই প্রিয় শাড়িটি আমার এক দূরসম্পর্কের মামা যার ছিল ক্লিপটোম্যানিয়া রোগ তিনি নিয়ে গিয়েছেন। আম্মার শাড়ি নিয়ে আরেকটা গল্প হলো। আমরা কোনোদিন আম্মাকে ওনার শাড়ি ধোপার কাছে দিতে দেখিনি।

একদিন জিজ্ঞাসা করলে বললেন, ধোপার কাছে কাপড় দিলে নাকি ধোপার বৌ সেই শাড়ি পরে দুই একদিন বেড়ায়। তারপর শাড়ি ধুয়ে দেয়। আমি জানি না এটা ঠিক কি না। আম্মার সেটা বদ্ধমূল ধারণা।

একবার আম্মার একটা শাড়ি বেশি করে কলপ লাগিয়ে ধোয়া হয়েছে তো আম্মাকে বললাম, সেটা ধোপার কাছে ইস্ত্রি করতে পাঠিয়ে দিই। আম্মা রাজি হচ্ছিলেন না। তার কথা না শুনে সেই শাড়ি ধোপার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

কয়েকদিন পর যখন আমার ভাইকে ধোপার কাছ থেকে শাড়ি আনতে পাঠালাম, ভাই এসে যা জানালেন তা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। আম্মার শাড়িটা নাকি ধোপা ইস্ত্রি করে রোদে শুকাতে দিয়েছিল। কারণ ইস্ত্রির সময় বেশি পানি ব্যবহার করেছিল। তাই তা যেন শুকিয়ে যায় সে জন্য। কিন্তু তখনি একটা গরু এসে নাকি আম্মার সেই শাড়িটি চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিল যা পরার অযোগ্য হয়ে পড়ে। ধোপা অবশ্য শাড়ির দাম দিয়ে দিতে চেয়েছিল। আম্মা সেটা নেননি। কয়েকদিন আগে আম্মার সব শাড়ি শুকানোর জন্য আলমারি থেকে বের করলেন।

আম্মার সব শাড়ি ছাদে নিয়ে গিয়ে যেভাবে যত্ন করে শুকালেন তা ছিল দেখার মতো দৃশ্য। তা কোনোদিনই ভুলবো না। আমার আম্মার ধৈর্য পাহাড়ের মতো। আমার কাপড়-চোপড়ের মধ্যে হঠাৎ আম্মা পেয়ে গেলেন আমার দাদির স্মৃতি স্বরূপ রাখা একটা শাদা শাড়ি। আম্মা সেই শাড়িটা খুলে দেখেন একটু দাগ পড়েছে। আম্মা তখনি সেই শাড়ি ধুয়ে দিলেন। তারপর যত্ন করে এনে আলমারিতে রাখলেন, আমার ছোটবোন তা দেখে আম্মাকে বললো, আম্মা, দাদি কবে আসবেন?

আমার দাদি প্রায় দুই যুগ আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু দাদির এই শাড়ির মাধ্যমে দাদির প্রতি আম্মার শ্রদ্ধাটাকেই আমাদের দেখালেন।

শাহী ঈদগাহ, সিলেট থেকে

চেনা

– রাইনা নেহরিন শ্রাবণী

আমার চেহারা পচানব্বই শতাংশ বাঙালি মেয়ের মতো। গায়ের রঙ অতিরিক্ত ফর্শা ও চুল কাধ পর্যন্ত বলে একশ ভাগ বাঙালি চেহারা বলা যায় না। যাই হোক। আমার চেহারা, হাইট, ফিগার সব কিছুর সঙ্গেই শাড়ি খুব বেশি মানিয়ে যায়। শাড়ি পরলে সবার প্রশংসা শুনতে পাই বলেই হয়তো স্কুল, কলেজের সব ফাংশনে শাড়ি পরার প্রতি আমার এতো আগ্রহ ছিল। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলেই আমার প্রথম চিন্তা হয় হলুদে কি শাড়ি পরবো। মোটকথা শাড়ির প্রতি আমার একটা অদ্ভুত দুর্বলতা সব সময় কাজ করে।

যাই হোক। আমার বন্ধু তানিম একদম রোবট টাইপ ছেলে, ওর মধ্যে আবেগ জাতীয় বাহুল্য কিছুই নেই। বুয়েটে পড়াশোনার চাপে দিন দিন ও আরো জড় পদার্থ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দুজনের মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হয়। কিন্তু একই শহরে থেকেও ক্লাস নিয়ে দুজনের ব্যস্ততার কারণে হয়তো বছরে মাত্র দুই তিন বার দেখা হয়। তাও আমারই উদ্যোগে। সব সময় সযত্নে গোপন করে রাখলেও আমরা দুজনই ভালো করে জানি মনে মনে একজন আরেকজনকে ভীষণ ভালোবাসি।

তানিমের মতো সিরিয়াস একটা ছেলের মুখ থেকে ভালোবাসার কথা বের হবে এটা আশাই করতে পারি না। আর আমিও নিজে থেকে কিছুতেই ওর কাছে আমার দুর্বলতা প্রকাশ করবো না। যাই হোক, এভাবেই চলছিল, একদিন ফোনে হুট করে আমরা প্ল্যান করলাম সেদিন বিকাল পাচটায় আমরা রেইনবোতে দেখা করবো। জানি না কেন সেদিন খুব শাড়ি পরার শখ হলো। সত্যি কথাটা হলো, আমি হয়তো ওকে মুগ্ধ করতে চাচ্ছিলাম। আম্মুকে বান্ধবীর জন্মদিনে যাওয়ার কথা বলে আসমানি নীল শাড়ি, ম্যাচ করা চুড়ি পরে সুন্দর করে সেজে হাজির হলাম দোকানটায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ও ঢুকলো এবং অবাক ব্যাপার চারদিকে চোখ বুলিয়ে আমাকে খুজে না পেয়ে তৃপ্তির হাসি হাসলো। যেন আমার আগেই পৌছে গেছে!

আমি তো অবাক শুধু শাড়ি পরার কারণে একদম চিনলোই না আমাকে? রেগে গিয়ে কাছে এসে বললাম, কি চেনা যায় না?

ও একবার আমার দিকে তাকিয়েই লাজুকভাবে চোখ নামিয়ে বললো, হুম, চেনা কষ্ট।

আমি তো পুরো ঝগড়ার মুডে।

কেন? চেনা যাচ্ছে না কেন? কি মনে হচ্ছে আমাকে?

আমাকে অবাক করে ওর ছোট উত্তর, মিষ্টি নীল পরী। বলেই সে আলতো করে আমার হাত ধরলো।

খুশিতে আমার বুক কাপলেও আড়চোখে আরেকবার ভালো করে ওকে দেখে নিলাম যে, এটা কি সত্যিই তানিম! ওকে চিনতে তখন আমারই কষ্ট হচ্ছিল। কারণ ওর মতো রোবটিক একটা ছেলের পক্ষে এ রকম অসাধারণ রোমান্টিক আচরণ কিভাবে সম্ভব? শুধুই কি শাড়ির কল্যাণে?

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

সিস্টার

– রাত্রি

একজন সিস্টারের কথা লিখবো। তিনি আমাদের একটা সাবজেক্টের ক্লাস নেন। ধরে নিলাম তার নাম আলো। *সিস্টার আলো।* আমাদেরকে তিনি জ্ঞানের আলো বিতরণ করেন। তাই এ নামটাই পছন্দসই মনে হলো।

সিস্টার সব সময় শাদা শাড়ি পরেন। কি অদ্ভুত ভালো লাগে! আমার কখনোই শাড়ির প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু সিস্টারকে দেখে শাদা শাড়ির প্রতি একটা মুগ্ধতা আমার মনে ঠাই নিল। অনেক দিন থেকেই মনে মনে ভাবছি, সিস্টারকে একটা শাদা শাড়ি গিফট দেবো। শুরু হলো শাদা শাড়ি খোজার অভিযান। এতো শাড়ি দেখে কেমন জানি একটা ঘোর লেগে গেল। অবশেষে পাওয়া গেল আমার মন মতো ব্লক করা একটা শাদা শাড়ি। অবশ্য এটার পেছনে রয়েছে অনেকের সহযোগিতা এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

সেদিন ছিল আমার জন্মদিন এবং সেই সঙ্গে দিনটি একটি Universal day বা সার্বজনীন বিশ্ব দিবস। যাহোক, গেলাম সিস্টারের কাছে। কিন্তু সেদিন এতো মেয়ে সিস্টারের জন্য গিফট নিয়ে গেছে যে, সিস্টার কিছুটা পরিশ্রান্ত হয়েই সবার জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমাকেও ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন আর সবার প্রতি ন্যায় বিচার হবে না সে জন্য। অনেকবার বলেছেন সরি।

তারপর অবশ্য শাড়িটা সিস্টারকে দিয়েছি এবং তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন। আমার এতো ভালো লেগেছে। তবে কখনো সিস্টারকে শাড়িটি পরতে দেখিনি। হয়তো তিনি সেটাকে সযত্নে তুলে রেখেছেন স্মৃতি হিসেবে। তবুও তিনি শাড়িটা একদিনের জন্য পরলেও খুব খুশি হতাম। আমার শুভ্র ভালোবাসা জড়িয়ে থাকুক তার সর্বাঙ্গে। তার শুদ্ধতা, ভালোবাসা হয়ে থাকুক আমার জীবনের প্রেরণা।

সামনে পরীক্ষা। সিস্টারের একটা কথাই বার বার মনে পড়ছে।

আমার বেচে থাকার জন্য তো খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। কি দরকার ছিল এতো সবের? তোমরাই তো আমার সবচেয়ে বড় গিফট।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

ওয়ান্ডারফুল

– মিলন

মেঘলা আকাশ। বাতাস বইছে জোরালোভাবে এবং সঙ্গে দুই এক ফোটা বৃষ্টিও পড়ছে। এমনি এক পড়ন্ত বিকেলে আমি এবং আমার বন্ধু তূর্য যাচ্ছিলাম এক বিয়ের অনুষ্ঠানে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি কোনো রিকশা নেই। বিআইটি থেকে ফুলবাড়ি গেট পর্যন্ত হেটেই গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানেও কোনো বেবিট্যাকসি চলছে না। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রবকে কারা যেন গুলি করে হত্যা করেছে, তার জন্য রাস্তায় কোনো গাড়ি চলছে না। ভ্যান আর রিকশা ছাড়া কিছু নেই। রিকশায় চড়লাম দুইজন।

রিকশা চলছে। চারপাশের লোকজনের মধ্যে বেশ সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করলাম। আবদুর রবের কথা আগেই শুনেছি। সাংবাদিক শামসুর রহমান হত্যা থেকে শুরু করে অনেক অপকর্মের কথাই শোনা যেতো তার নামে। রিকশাচালকের কাছে আবদুর রব সম্পর্কে জানতে চাইলাম। মুখে কোনো উত্তর নেই। এক মনে রিকশা চালাচ্ছে। মনে হলো ভয়ে কিছু বলছে না। আমিও আর পরে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। ভাবছিলাম সাংবাদিক শামসুর রহমান হত্যার বিচার আদৌ হবে কি না। রিকশা যখন খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখনই ঘটলো ঘটনাটি।

আপা, আপনার আচল! এই বলে তূর্য হাতের ইশারায় পাশের রিকশার মেয়েকে ডাকলো। মেয়েটির আচল অনেকটা নিচে নেমে রিকশার চাকার প্যারালালি ঝুলছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই বাতাসের ঝাপটায় আচলটি এসে পড়ে তূর্যের হাতে। মেয়েটি অমনি ভাইয়া বলে চিৎকার। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাশের রিকশাটি থেমে গেল এবং আমাদেরটাও থামিয়ে দিল। ছেলেটি এক লাফে রিকশা থেকে নেমে এলো এবং তূর্যকে এলোপাতাড়ি ঘুষি মারা শুরু করলো। কোনো রকমে থামালাম এবং ঘটনাটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

মেয়েটির এক কথা, তিনি আমার আচল ধরে টান দিয়েছেন। লোকজন জমা হতে শুরু করলো এবং প্রায় সবাই মেয়েটির পক্ষ নিল। শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে উদ্ধার পেলাম। মেজাজটাই বিগড়ে গেল। পথে পথে বিপত্তি। মেজাজ আরো বিগড়ে গেল তূর্য যখন বললো, দোস্ত, এতো কিছুর পরও মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে।

শেষ পর্যন্ত নিউ মার্কেটের মসজিদে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে রিকশা নিয়ে উপস্থিত হলাম নিরালা আবাসিক এলাকার সেই কাঙ্ক্ষিত বিয়ে বাড়িতে। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আরেকবার অবাক হওয়ার পালা। সেই মেয়েও বিয়েতে উপস্থিত। এক পর্যায়ে পরিচয় হলো। নাম রিনি, সম্পর্কে কনের খালাতো বোন। ঘটনাটি যখন পুনরায় বুঝিয়ে বললাম তখন তারা ভাইবোন দুজনেই ক্ষমা চাইলো।

ঘটনার মাস খানেক পর একদিন তূর্য এসে বললো, দোস্ত, রিনি ফোন করেছে ওয়ান্ডার লেনে যাওয়ার জন্য।

তাকে বললাম, দেখো, আবারও ভাঙার (খুলনার আঞ্চলিক ভাষায় মার দেয়াকে ভাঙা বলে) ব্যবস্থা করেছে কি না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বন্ধুটির ইচ্ছায় নির্ধারিত দিনে গিয়ে হাজির হলাম ওয়ান্ডার লে

নে। যাওয়ার কিছুক্ষণ পর এক বান্ধবীসহ রিনি উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলাম আবারও ওয়াশের ব্যবস্থা করেছেন নাকি?

বললো, না, সে রকম কিছু না। আপনার বন্ধু যখন একবার আচল ধরেই ফেলেছে তখন তাকে সারা জীবনের জন্যই আচলে জড়িয়ে রাখতে চাই।

রিনির কথা শুনে সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলাম। তূর্য শুধু অস্ফুট স্বরে বললো, ওয়ান্ডারফুল!

বিআইটি, খুলনা থেকে

এলোমেলো

– জাহাঙ্গীর অরুণ

বিয়ে করবো বলে পালিয়েছি ঠিকই কিন্তু পকেট ছিল হালকা। PRIDE থেকে আমারই পছন্দে একটা শাড়ি কিনে আনলাম। জীবনে প্রথম শাড়ি কেনা। তাও আবার বিয়ের। যথাস্থানে শাড়ি নিয়ে ফিরলাম। বুঝলাম PRIDE-এর বদলে এসেছে PRIED-এর শাড়ি। নকল প্রবণতার ভিক্টিম।

বৌ নিজেই সাজছে। শাড়ি পড়তে গিয়ে দেখা গেল পেটিকোট আর ব্লাউজ নেই। টেনশন। এতো বড় শাড়িটা পরা গেল না। আবার যাওয়া। কিন্তু রঙ কি হবে তা তো জেনে আসিনি। শুধুই সমস্যা। না জানি কপালে কি আছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই দিনগুলোর কথা। আমাকে সে মেঘ বলে ডাকতো। সে আর আমি প্রায়ই নীল আকাশে শাদা মেঘ হয়ে ভেসে ভেড়ানোর কথা বলতাম। এবং সে আকাশ-নীল শাড়ি হয়ে মেঘকে জড়িয়ে থাকতো। সেই ভেবে বিয়ের নীল শাড়িটার সঙ্গে শাদা রঙ দেখে পেটিকোট ও ব্লাউজ নিয়ে ফিরলাম।

সে শাড়ি পরলো বৈশাখে কিংবা রবীন্দ্রনাথের গল্পের নায়িকার মতো কুচি না করে। দ্রুত আনুষ্ঠানিকতা শেষে সে আমার বৌ হয়ে গেল। চাবিগুলো বুঝিয়ে দিলাম তার শাড়ির আচলে। আর সে বুঝে নিল স্বামীকে। পা ছুয়ে সালাম করলো। আলতো চুমুতে ঘোমটা সরিয়ে ভালোবাসলাম তাকে।

এক সময় শাড়িকে ঝামেলার পোশাক হিসেবেই মনে হতো। কিন্তু বৌটা যখন চমৎকার করে শাড়িতে সাজে, অপূর্ব লাগে। এ দেখার যেন শেষ নেই। আর সকালের প্রয়োজনীয় স্নান সেরে যখন শাড়ি পরে খোপায় সদ্য ফোটা ফুল গুজে আমার ঠোটে আলতো ছোয়ার পরশে ঘুম ভাঙায়, কি যে ভালো লাগে! মনে হয় এ মুগ্ধতার শেষ নেই। সংসারের কাজগুলো যখন নিপুণ ব্যস্ততায় সে করে, শাড়িটা কোমরে পেচিয়ে কিংবা গুজে নেয়। মাঝে মধ্যে আচলে ঘাম মুছতে মুছতে, কখনো শাড়িটা উচু করে হেটে খুব কাছে এসে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে যায় ভীষণভাবে। তাকে জড়িয়ে ধরি। শাড়ি দিয়ে আমাকে ঢেকে নেয়। এবং রাতে আমাদের একান্ত সময়ের জন্য শাড়ির বিশেষ একটা সুন্দর সাজ আছে তার। কিন্তু সবই এলোমেলো হয়ে যায় ভালোবাসার উন্মাদনায়। সে বলে, এলোমেলো হওয়ার জন্যই নাকি এ সাজ। মনে হয় শাড়ির সাজ শুধু তারই জন্য।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন

মগবাজার, ঢাকা থেকে

নতুন চাদ

– আল–মামুন সরকার তিতাস

আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন থেকেই স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মঞ্চ নাটকে অংশ নিতাম। মঞ্চ নাটকের মেয়ে চরিত্রে অভিনয় করতে হতো আমাকে। সেই মেয়ে চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে শাড়ি পরতে হতো আমাকে। ছোটবেলা থেকেই যেন আমার নাটক ও কৌতুক লেখার অভ্যাস। এসব মঞ্চ নাটকে শাড়ি পরে অভিনয় করতে গিয়েই বেড়ে যায় আমার অনেক ভক্ত শ্রোতা। তাছাড়া স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা খুব স্নেহ করতেন আমাকে। নাটকের পাগল চরিত্রে বেশি অভিনয় করতাম যা দর্শক মহলকে উত্তেজিত করে তুলতো। দুটি নাটকে মেয়ে চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। একটিতে সুন্দর অভিনয়ের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলাম আমাদের স্থানীয় এমপির কাছ থেকে।

মহান ১৬ ডিসেম্বর। স্কুলে মঞ্চ নাটকের আয়োজন করা হয়েছিল। সিরাজ হায়দার রচিত, *বেয়াদবি মাফ করবেন* নাটকে ছিলাম নায়িকা চরিত্রে। তাই শাড়ি পরতে হয়েছিল।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমার প্রবেশ। মঞ্চে এসে অভিনয় করতে থাকি। আমাকে দেখে দর্শকরা তুমুল উত্তেজনা প্রকাশ করছে। অভিনয় শেষে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করি।

নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে আবারও আমার নায়কের সঙ্গে খানিকক্ষণ অভিনয় করার পর রেকর্ডে বাজানো গানের সঙ্গে নাচতে হয় নায়কসহ আমাকে। কুমার শানু এবং অলকা ইয়াগনীর কণ্ঠে, *অঙ্গে অঙ্গে সারা অঙ্গে...* গানটিতে নাচছিলাম আমি এবং নাটকের নায়ক। আমার পরনের শাড়িটা ছিল পিচ্ছিল জর্জেট।

বার বার গানের সঙ্গে ঠোট মিলিয়ে নায়ক জড়িয়ে ধরছে আমাকে। নায়কের জড়াজড়িতে এক সময় গায়ের পিচ্ছিল জর্জেট শাড়িটা আমার কোমরে গোজা কুচিসহ খুলে যায়। গানের তালে তাল হারিয়ে যাই আমি। কিছু পরে শাড়িটা স্টেজে খুলে যায়। আর ওদিকে শাড়ির নিচে আমার শাদা জাঙ্গিয়াটা নতুন চাদের মতো দেখা যাচ্ছে। স্টেজের পাশে বসা মেয়েরা একে অন্যের ওপর ঢলে পড়ে হাসছে। তখন পর্যন্ত টের পাইনি শাড়ি যে খুলে গেছে। নাটকের পরিচালক ইস্পাহানী রিপন ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিল শাদা জাঙ্গিয়ার দিকে। আমি অবস্থা বুঝতে পেরে শাড়িটাকে মুঠো করে ধরি। এবং নাচের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত প্রস্থান করি মঞ্চ থেকে। সেই থেকে আর কোনোদিন শাড়ি পরে নাটকে মেয়ে চরিত্রে অভিনয় করিনি।

কাইতলা, নবীনগর থেকে

ইনডিয়ান পৃন্ট সুতি

– অন্তর উদাস

কর্মক্লান্ত দিবসের শেষ অধ্যায়। সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। বাড়ির পাশে বিশাল দীঘির পাশে বসে সূর্যাস্ত দেখছি। সূর্যের শেষ বিদায়ী রশ্মিটুকু শান্ত দীঘির জলে পড়ে ঝিকিমিকি করছে। এমন সময়

চাচাতো ভাই অন্তু এসে একটি চিঠির খাম আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। চিঠি খুললাম। খালাতো ভাই সৈকতের লেখা। চিঠিতে আসন্ন দুর্গাপূজায় আখাউড়ায় যাওয়ার জোর আমন্ত্রণ। আমি আখাউড়ায় গেলেই আমাকে নিয়ে সে আগরতলায় পূজা দেখতে যাবে, অন্যথায় নয়।

ভিন দেশে পূজা দেখার নিমন্ত্রণ। এ যেন আকাশের চাদ হাতে পাওয়া। পুলকে আমার মন ধরে না। প্রচার করে বেড়াতে লাগলাম, আমি কিছুদিনের মধ্যে ইনডিয়াতে পূজা দেখতে যাচ্ছি। আমার এই কথা এক সময়ে পরশি বা নীলাভাবীর কানে পৌছাতেও দেরি হলো না।

একদিন ভাবী আমাকে ডেকে বললেন, তুমি নাকি ইনডিয়া যাচ্ছো?

জি।

ভালো, তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে তোমাকে একটি অনুরোধ করবো।

করুন।

কথা রাখবে?

রাখবো।

ইনডিয়ান পৃন্টের সুতি শাড়ি আমার খুব পছন্দ। এক পিস শাড়ি আনতে পারবে?

এই কথার পর ভাবী আমার হাতে গোটাকয়েক একশ টাকার নোট ধরিয়ে দিতে চাইলেন, এমনকি পীড়াপীড়িও শুরু করলেন। ভাবীকে সাফ সাফ বলে দিলাম, টাকা যদি নিতে হয়, শাড়ি এনেই নেবো এর আগে নয়।

ভাবী আমার মেজাজ সম্পর্কে জানতেন। তাই আর বাড়লেন না।

যথাসময়ে বাসে, ট্রেনে, রিকশায় করে আখাউড়ায় পৌছালাম। দুপুরের খাবার খেলাম। তারপর আমি ও সৈকত বিকেল নাগাদ রিকশায় করে পূজা দেখার জন্য সীমান্তে পৌছালাম। পঞ্চাশ টাকার বিনিময় সীমান্ত পার হলাম। বিদেশের মাটিতে এই প্রথম। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে দেহ–মন ভরে গেল। এক সময়ে আমরা আগরতলা পৌছালাম। তখনো ঘরে ঘরে সন্ধ্যা বাতি জ্বলতে অনেক দেরি। তাই মার্কেটে ঢুকলাম। পূজার কারণে অধিকাংশ দোকানই বন্ধ। তবে কিছু কিছু দোকান খোলা রয়েছে। তেমন ভিড় নেই। আমি একটি শাড়ির দোকানে সুতি শাড়ি চাইলাম। থরে থরে সুতি শাড়ি বিছিয়ে দেয়া হলো। গাঢ় নীল জমিনের ওপর শাদা পৃন্টের শাড়ি বেছে নিলাম। ভাবীর ফর্শা শরীরে বেশ মানাবে।

সন্ধ্যার পর পরই পূজা দেখার জন্য বেড়িয়ে পড়লাম। মনে হলো, পূজার মণ্ডপগুলো অপরূপ সাজসজ্জায় জেগে উঠেছে। এক এক মণ্ডপ যেন এক এক স্বপ্নপুরী। একটির সঙ্গে আরেকটির মিল নেই। সত্যিই এসব না দেখলে বোঝানো দায়।

যাই হোক পূজা দেখার জন্য মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়। রাস্তায় কোনো যানবাহন চোখে পড়লো না শুধু মানুষের স্রোত। সবাই সৃশৃঙ্খলভাবে ঘুরছে, ফিরছে। কোনো গণ্ডগোল নেই।

ভালোই লাগলো এই অনাবিল পরিবেশ, স্বচ্ছন্দ চলাফেরা। এভাবে মণ্ডপে মণ্ডপে পূজা দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। কিন্তু ক্লান্তি এলো না। সকালের নরম রোদে স্নাত হয়ে আখাউড়ায় ফিরলাম।

আখাউড়ায় কিছুদিন বেড়ানোর পর একদিন বাড়িমুখী হলাম। বাড়িতে এসেই ভাবীকে শাড়িটি দিলাম। ভাবী এবারও আমার হাতে টাকা গুজে দিতে চাইলেন। আমি সবিনয়ে বললাম, আগরতলায় পৌছেই প্রথম আপনার জন্য শাড়িটি কিনি। এই শাড়ি নিয়ে সারা রাত রাস্তায় রাস্তায়, মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরেছি। এতে আমার ভালোলাগার অনুভূতি আছে। আর এই ভালোলাগার জিনিস অর্থের বিনিময়ে পরিমাপ করা ঠিক নয়। আপনাকে এই শাড়ি উপহার হিসেবেই দিলাম। এতেই আমার সুখ।

ভাবী হয়তো কিছু বুঝেছেন। আর টাকা সাধলেন না। মুচকি হেসে বললেন, পাগল! রাতে এসো, গল্প করা যাবে।

এদিকে রাতে খাওয়ার পর পারিবারিক আড্ডা জমে উঠলো। আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু আমি। আখাউড়ার যাওয়ার কথা, খালা, খালু, খালাতো ভাইবোনদের কথা, পূজা দেখার কথা বলতে বলতে রাত হয়ে গেল। হঠাৎ করে ভাবীর কথা মনে পড়লো। এক তিল না দাড়িয়ে সত্বর ভাবীর বাড়িতে চলে গেলাম। সারা বাড়ি যেন নির্জন–নিঝুমপুরী। শুধু ভাবীর ঘরে আলো দেখতে পেলাম। দরজায় নক করলাম। দরজা খুলে গেল। দেখলাম আমার উপহারের শাড়ি ভাবীর গায়ে লেপ্টে আছে। ভাবীকে মনে হলো :

কইন্যা পরিলো শাড়ি পিনলো বড় ঠাটে
নীল শামের কালে যেমন সূর্য রইলো পাটে।

ভাবীকে আমি পলকহীনভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। আমার নাকের আগা একটু টিপে দিয়ে সম্মোহিত কণ্ঠে ভাবী বললেন, এভাবে তাকিয়ে কি দেখছো?

গভীরভাবে ভাবীর মুখের দিকে তাকালাম দেখলাম, তার পরিপুষ্ট সহাস্য মুখখানিতে দুষ্টুমি খেলা করছেন।

ভাবী এক সময়ে বলে উঠলেন, তুমি যে শাড়ি কিনেছো, শাড়ির নাম কি?

সে তো খেয়াল করিনি।

ওরে দুষ্টু। জানো না?

সত্যি।

এই শাড়ির নাম হলো সঙ্গম শাড়ি।

শাড়ি তো চিনি। কিন্তু *সঙ্গম* শব্দের মানে তো বুঝি না।

বোঝাচ্ছি বলেই আমার মাথা তার বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। তার বুকের মধ্যে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেলাম। আর সেই সমুদ্রের গর্জনের রেশ আমার তাবৎ দেহ–মন–সত্তার সুখের পরশ বুলিয়ে দিলেন। আমি আর আমার মধ্যে নেই। তাকে বসনমুক্ত করলাম। ভাবীর যে রূপ দেখলাম তার বর্ণনা দিতে অক্ষম। তবে এক্ষেত্রে কালিদাসের কাব্যকথার ওপর কিঞ্চিৎ ভরসা করা যায়। যেমন :

যুবতীজনের সার শ্রেষ্ঠ বিধাতার,
তুল্য নাই কেহ তার কাছে।

ভাবী এক সময়ে তার সমুদ্রে জাহাজ ভাসানোর ইঙ্গিত দিলেন। এতোদিন শুনেছি, পড়েছি সমুদ্রে সুগভীর আধারে মূল্যবান রত্নরাজি লুকায়িত থাকে। আজ ভাবীর সুগভীর সমুদ্রে জাহাজ চালিয়ে বুঝতে পারলাম তার আধারে শুধু রত্নরাজিই নয় বরং অমিয় সুধার সরব মুখরতায় উর্বর। এক সময়ে আমাদের মিশন শেষ হলো।

ভাবী বললেন, তুমি আমাকে শাড়ি উপহার দিয়েছো, আমি তোমাকে মিলন স্মৃতি দিয়ে দিলাম। তা কখনো ভুলবে না। এবার অর্থ বুঝলে?

একদিন বলা নেই, কওয়া নেই আমার পড়শি ভাইটি আমেরিকা থেকে উড়াল দিয়ে বাংলাদেশে নামলেন। দুই মাসের মধ্যে সব কাগজপত্র ঠিকঠাক করে ভাবীকে নিয়ে আমেরিকায় উড়াল দিলেন। ভাবী এখন সুদূর আমেরিকায়। বড় শহরে থাকেন, অট্টালিকায় ঘুমান। ব্যস্ত সময় কাটান। তার কি সে গণ্ড গ্রামের কথা, ছোট ঘরের কথা, পাগল পড়শির কথা মনে পড়ে? হয়তো পড়ে, হয়তো পড়ে না। ভাবীর দেয়া সেই স্মৃতি, ভাবীকে দেয়া আমার শাড়ির কথা আমি ভুলতে পারি না। এ দুটোই আমার সেরা স্মৃতি, সেরা উপহার।

হরিপুর, মেঘনা, কুমিল্লা থেকে

বাবা

আমাদের সময় বাচ্চাদের নিয়ে এতো আহ্লাদ করার সময় ছিল না বাবা মায়ের। থাকার কথাও না। দশ বারোজন ভাইবোন আমরা। তাই বলে আদরের কমতি ছিল না। কোনো কিছুর শখ হলে আবদার করেই আদায় করতে হতো।

আমার তখন সাত আট বছর বয়স হবে। খুব শখ হলো একটি শাড়ি কেনার। বাবাকে বলে হাট থেকে একটি সবুজ শাড়ি আনিয়েছি। সেই শাড়ি পেয়ে যে কি খুশি হয়েছিলাম সে স্মৃতি আজো মনে পড়ে। সারাদিন শাড়ি পরে সারা পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছি। রাতে বাবার পাশে শাড়ি পরেই ঘুমিয়েছি। কখন যে শাড়ি নির্দিষ্ট স্থান থেকে বহু উপরে ওঠে গেছে টেরই পাইনি। বাবা ফজরের নামাজ পড়ার জন্য উঠে আমার এ বেহাল অবস্থা দেখে শাড়ি টেনে নিচে নামিয়ে দিচ্ছেন তখন টের পেয়ে ঘুমের ভান ধরেই শুয়ে থাকলাম। সারাদিন বাবার সামনেই যাইনি লজ্জায়।

এরপর আর কোনো রাতে শাড়ি পরে শুইনি।

এক বছর হলো বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন দূরে, বহু দূরে। আছেন শুধু স্মৃতিতে। এ যে কি কষ্ট তা বোঝানো যাবে না।

নামবিহীন

কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে

বেদুইন প্রেম

– মাহমুদ আলম খন্দকার মামুন

সালতানাত আল ওমানে থাকার সময়কার ঘটনা। রাজধানী মাসকাট থেকে অনেক দূরে এক প্রত্যন্ত, ছোট শহর আল খাইমা-য় আমি একটি শপিং কমপ্লেক্সে সেলসম্যান হিসেবে কাজ করি। আমি যে সেকশনে কাজ করতাম সেটি ছিল মেয়েদের কাপড়ের অর্থাৎ মহিলাদের তৈরি পোশাকের। দেড় বছর

একটানা ওই সেকশনে কাজ করি। এ সময়ে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। ক্রেতা হিসেবে অনেক মহিলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এর মধ্যে বিশেষ একজনের কথা আজ বলবো।

মালিহা। এক আরব তরুণী। ওমানেই তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। এরপরও সে ওমানি নাগরিক নয়। সে বেদুইন সম্প্রদায়ভুক্ত। স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে *বেদু।* তার কোনো জাতীয়তা নেই। কোনো পাসপোর্ট নেই। নিজ দেশে সে পরবাসী।

মালিহা অসাধারণ সুন্দরী নয় যে তাকে দেখে প্রথমেই প্রেমে পড়া যায়। নিতান্তই সাধারণ, সহজ সরল। অন্য আট দশজন আরব মেয়েদের মতো তার গায়ের রঙ ও ফর্শা, দীঘল কালো চুল, গোলাকৃতি মুখ। এতো কিছুর পরও সে যখন হাসতো, অসাধারণ মনে হতো। তার হাসি কখনোই ভোলার নয়।

ওই দেড় বছরে আমাদের মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্ক ছাপিয়ে একটি অন্য রকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তার সরলতা, সাবলীলতা পছন্দ করতাম। সে আমাকে খুব কাছের কেউ মনে করতো। রক্ষণশীল এ আরব সমাজে আমাদের মেলামেশা অনেক ঝুকিপূর্ণ ছিল। তাই শহর ছেড়ে দূরে এক মাজরায় (পার্কে) মাসে দুই তিনবার আমরা মিলিত হতাম।

একটা পার্কের মতো জায়গাটি। দুপাশে অনেক খেজুর বীথি। মাঝে কিছু ফুল, লতাপাতা জাতীয় গাছ। এর মধ্যে নিরিবিলি জায়গায় দেখে বসে আমরা গল্প করতাম। তাকে আমার দেশের মানুষের কথা বলতাম, প্রকৃতির কথা বলতাম, সৌন্দর্যের কথা বলতাম। সে মুগ্ধ হয়ে শুনতো।মাঝে মধ্যে কিছুটা সাহসী হয়ে তার গোলাপি ঠোট জোড়ায় চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতাম। প্রথম প্রথম সে বাধা দিতে চাইলেও পরে বেশ উপভোগই করতো। নিভৃতে যখন তাকে জড়িয়ে ধরে তার সুডৌল, ফর্শা স্তন জোড়া নিয়ে খেলা করতাম তখন সে খুব পুলকিত হতো। কারণ এ রোমাঞ্চ, এ অভিজ্ঞতা তার কাছে নতুন।

সে প্রায়ই বলতো তাকে নিয়ে পালিয়ে এ দেশ ছেড়ে আমার দেশে চলে যাবার জন্য। কারণ আরব সমাজ কখনো আমাদের বিয়ে মেনে নেবে না। কিন্তু তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি যে, তাকে নিয়ে আমার দেশে যাওয়া কোনোদিনই হবে না। কারণ তার কোনো পাসপোর্ট নেই। অবশেষে সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব রাখে বলে, যদি তোমার দেশে না-ই যেতে পারি তবে তোমার বৌ হতে চাই। আমাকে এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও নিয়ে বিয়ে করো।

কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে ওই মুহূর্তে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই সহজ সরল মেয়েটি আরো দুঃখ পাক তা চাইনি। তাই দেশে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিই। তাছাড়া দেশ থেকে তাগাদাও ছিল।

একদিন অনেক দূরে রাজধানী মাসকাটে গিয়ে তার জন্য একটি দামি শিফন শাড়ি ও একজোড়া সোনার দুল কিনে আনি।

পার্কে মালিহার হাতে শাড়ির প্যাকেট ও দুল জোড়া দিয়ে বলি, মালিহা, তোমাকে তো আমি কিছুই দিইনি। এগুলো তোমার জন্য।

মালিহার চোখে জল দেখতে পেলাম।

ঠিক পরের শুক্রবার মালিহাকে শাড়ি ও দুল পরে এখানে আসতে বললাম। সে জানতে চাইলো কিভাবে শাড়ি পরতে হয়। শাড়ি পরার যতোটুকু পদ্ধতি আমি জানি তা তাকে বললাম।

পরের শুক্রবার আসার আগেই আমাকে জরুরি প্রয়োজনে দেশে চলে আসতে হয়। পরে আর কোনোদিন ওখানে আমার যাওয়া হয়নি। জানি না শাড়ি পরলে মালিহাকে কেমন দেখাতো?

কুয়েত থেকে

রাগ

– মিম

শাড়ি নিয়ে লিখতে বসে ভাবছি কি লিখবো? আমি তো ছেলেমানুষ, মেয়ে হলে কোনো না কোনো ঘটনা থাকতো। তবুও একটা ঘটনা আজো আমার মনে পড়ে মাঝে মধ্যে এবং তখনি মন খুব খারাপ হয়। এই ঘটনা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও আমার কাছে বেদনাদায়ক ও পীড়াদায়ক।

আমরা অনেকগুলো ভাইবোন, আমি সব থেকে ছোট। আমাদের আর্থিক দিকটা খুব একটা ভালো ছিল না। আব্বা প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিলেন। আবাদি জমি নেই বললেই চলে। আমাদের পরিবারে সদস্যের সংখ্যা ছিল আট। তাই কোনোমতে দিন চলে যেতো।

পনেরো বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন সাত কি আট মনে নেই। সম্ভবত ক্লাস টু-তে পড়তাম। স্কুলে যেতে হতো এক মাইল দূরে পায়ে হেটে। সকালে স্কুল ছিল। তাই অল্প একটু নাশতা খেয়ে স্কুলে যেতাম এবং ফিরে আসতাম বারোটায়। এতে আমার প্রচণ্ড ক্ষিধে লাগতো। এসে সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসতাম।

একদিনের ঘটনা। সেদিন সম্ভবত নাশতা না খেয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম। আসতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছিল। বাড়িতে এসে দেখি আম্মা বাড়িতে নেই। মনে করলাম, পাশের বাড়িতে বেড়াতে গেছে, ডাকলে এখুনি আসবেন। তাই নিজে রান্না ঘরে গিয়ে দেখলাম খাওয়ার কিছু আছে নাকি। অনেক খোজার পরও কিছু পেলাম না। ভাবলাম ঘরে রেখেছেন। ঘরে যেতেই দরজার উপরে দেখি শিকলে তালা ঝুলছে। আরো মেজাজটা খারাপ হলো। জোরে জোরে চিৎকার করে আম্মাকে ডাকতে শুরু করলাম। পাশের বাড়ি থেকে আওয়াজ এলো আম্মা সেখানে নেই, ও পাড়াতে বেড়াতে গেছে। রাগে অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করে কাদলাম। তবুও আম্মার ওপর থেকে আমার রাগ কমলো না। প্রচণ্ড রাগে তখন আমার মাথা ঠিক ছিল না।

ভাবছিলাম কিভাবে আম্মার ওপর আমার রাগের প্রভাব ফেলানো যায়। তারপর দেখলাম বারান্দায় অনেকগুলো কাপড় এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। হয়তো আম্মা কাপড়গুলো কাচার জন্য রেখেছিলেন। হঠাৎ মাথায় কি জানি বুদ্ধি খেললো। কাপড়গুলো নিয়ে রান্নাঘরে গেলাম এবং রান্নাঘরে রান্না করার জন্য যে চুলা ছিল সে চুলার ভেতরে কাপড়গুলো একটা লাঠি দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। হয়তো আমার তখন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। তাই সেদিন এই বড় ভুলটা করেছিলাম। এরপর কাদতে কাদতে আম্মার অপেক্ষা করতে লাগলাম। আম্মা এসে আমার কান্না থামাবেন এবং খেতে দেবেন।

কিছুক্ষণ পর আম্মা এলেন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেই চোখ গেল বারান্দায়। আমাকে কাপড়ের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললাম রান্নাঘরের কথা। আম্মা তাড়াহুড়া করে রান্নাঘরে গেলেন। এবং প্রচণ্ড রাগে বকতে শুরু করলেন।

কারণ চুলার ভেতরে আগুন ছিল এবং কাপড়গুলো সব পুড়ে গিয়েছিল। সেই কাপড়গুলোর সঙ্গে আম্মার একটা শাড়িও ছিল যা খুব দামি এবং আম্মার পছন্দের শাড়ি ছিল। আজো সেই শাড়ির জমিন, পাড় সব আমার মনে আছে। সেদিন আম্মা আমাকে নিষ্ঠুরভাবে খুব মেরেছিলেন। এতো মেরেছিলেন যে দৌড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

পালিয়ে গিয়েও রেহাই পাইনি সেদিন। পা কেটে রক্ত ঝরেছিল। আসলে দোষটা আমারই ছিল। চুলায় আগুন থাকা সত্ত্বেও কাপড়গুলো সেখানে দেয়া ঠিক হয়নি। পরে বুঝেছি আম্মা কেন ও রকমভাবে মেরেছিলেন।

এক. শাড়িটা আম্মার খুব পছন্দের ছিল। সেই শাড়ি তৎক্ষণাৎ কেনা সম্ভব হয়নি। দুই. আমাদের পরিবারে ওতোগুলো কাপড় পুড়ে যাওয়া মানে বিরাট ক্ষতি। পরে অবশ্য আম্মা আমাকে আদর করেছিলেন এবং কেদেছিলেন। সেই শাড়ির কথা আজো ভুলতে পারিনি, কোনোদিনও পারবো না।

ফকিরপাড়া, দিনাজপুর থেকে

অলৌকিক

– হোসেন মীর মোশাররফ

আমার শৈশবের সোনালি দিনগুলো কেটেছে কলকাতায়। আমার বাবা চাকরি করতেন কলকাতা পুলিশে। আমরা থাকতাম *পার্ক সার্কাস* এলাকার কংগ্রেস একজিবিশন রোডের বিশাল দাস ভবনের দোতলায় ফোর–বি নাম্বার ফ্ল্যাটে। অন্য একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন লেখক আনিস চৌধুরী। তিনি এখন প্রয়াত। দাস ভবনের ঠিক উল্টো দিকেই পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপো। প্রতি পনেরো মিনিট পর পর ডিপো থেকে ট্রাম বেরিয়ে আসতো। প্রতি ট্রামে দুটো করে কম্পার্টমেন্ট, ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেন্ড ক্লাস। কংগ্রেস একজিবিশন রোডের কাছেই রেল লাইনের ওপরে চার নাম্বার পুল। নিচে *তিলজলা* স্টেশন। স্টেশনের অদূরে ট্যানারি জোন। চামড়া ট্যান করার গন্ধ ভেসে আসতো।

ভবনের ছাদে দাড়ালে পার্ক সার্কাস ময়দান দেখা যেতো। সেখানে মুকুল ফৌজের ছেলেরা প্যারেড পিটি করতো। ময়দানের কাছেই *লেডি ব্রাবোর্ন* কলেজ। দাস ভবনের অদূরে ডাক্তার সেনগুপ্তের চেম্বার। সাকু মিয়ার হোটেল ও জুতো দোকানে লোক গম গম করতো। গির্জার কাছেই *জলযোগ* নামে মিষ্টির দোকান। সেই দোকানের *রাবড়ি* (দুধের সরের মিষ্টি) খুব বিখ্যাত।

পার্ক সার্কাস এলাকায় বিখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের বাড়ি। আমরা তাকে দেখতে যেতাম। এখনো ঝাউতলা রোড, কর্নেল বিশ্বাস রোড, থিয়েটার রোড, বালু হক্কাক লেন আর পার্ক স্ট্রিট আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমার বেশ মনে পড়ে, ঝাউতলা রোডের এক দোতলা ভবনের বাংলার চিফ মিনিস্টার শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক বাস করতেন। কাছেই এক ভবনে থাকতেন

ইঞ্জিনিয়ার হোসেন আলী। বানিয়াপুকুর এলাকায় এক ধোপা থাকতো। সে শ হিসেবে ময়লা কাপড়–চোপড় নিয়ে যেতো। কাপড় ধোলাই করে আমাদের পৌছে দিতো।

আমি পড়তাম দাস ভবনের পেছন দিকে অবস্থিত পার্ক সার্কাস মুসলিম গার্লস স্কুলে। প্রাইমারি সেকশনে ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়তো। মা আমাকে স্কুলে পৌছে দিতেন এবং ছুটি শেষে নিয়ে আসতেন। মা খুব নামাজ পড়তেন। ধোপা হয়তো বা নোংরা পানিতে শাড়ি কাচে এই আশঙ্কায় মা নিজের শাড়ি নিজেই কাচতেন। মা সাধারণত মিলের তৈরি শাড়ি পরতেন। শাদা জমিন। গাঢ় রঙের পাড়, লাল–সবুজ–নীল–কালো–খয়েরি কতো কি রঙ। ধোপা প্রায়ই বলতো, মাজি আপনার শাড়িগুলো দিন। আমি খুব যত্ন করে কাচবো।

মা শুধু হাসতেন। যথারীতি নিজের শাড়ি ছাড়া অন্যান্য কাপড়–চোপড় কাচতে দিতেন। শাদা জমিন আর নীল পাড়ের শাড়ি পরে মা যখন আমাকে স্কুলে পৌছাতে যেতেন, অন্যান্য মায়েরা জানতে চাইতে মা কোনো মিশনারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন কি না। মিলের মিহি সুতোর শাড়ি পরে মা খুব স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। আজকাল অমন সুন্দর শাড়ি আর দেখি না।

লালপেড়ে শাদা জমিনের শাড়িতে মাকে আশ্চর্য সুন্দর লাগতো। শুভ্রতা আর পবিত্রতার জন্য মাকে আমার অন্য জগতের বাসিন্দা মনে হতো। *পার্ক শো* সিনেমা হলের খুব কাছেই ছিল কৃশ্চিয়ানদের কবরস্থান। জায়গাটা পার্কের মতোই সুন্দর। মা কখনো কখনো আমাকে সেখানে বেড়াতে নিতেন। পড়ন্ত বিকেলে পাখিরা ফিরে আসতো কবরস্থানের গাছে। গাছ–গাছালির নিচে লালপেড়ে শাদা জমিনের শাড়িতে মাকে মনে হতো স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনো পরী। ঘরে আমি যখন একা থাকতাম, নাকের কাছে মায়ের শাড়ি নিয়ে শুকতাম। সেই শাড়িতে মায়ের গায়ের পবিত্র সুবাস পেতাম।

একদিন এক ভিখারিনী এলো আমাদের ফ্ল্যাটে। বড়ই ক্ষুধার্ত। মা তাকে কিছু ভাত আর তরকারি খেতে দিলেন। কি কাজে মা অন্য ঘরে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে ভিখারিনী বারান্দার দড়িতে ঝোলানো কয়েকটা শাড়ি থেকে একটা শাড়ি নিয়ে দ্রুত তার ঝোলায় ভরলো। পরে চট করে সরে পড়লো। কিন্তু বিধি বাম! নিচে দারোয়ানের হাতে ধরা পড়লো। কয়েকটা চড়–থাপ্পড়ও খেলো। গোলমালের শব্দ শুনে মা নিচে নেমে এলেন। দারোয়ান বললো, মাজি, এই ভিখারিনী আপনার শাড়ি চুরি করে পালাচ্ছিল। বলেই দারোয়ান আরেকটা চড় মারতে উদ্যত হলো।

মা তাকে ধমকের স্বরে বললেন, থামো তুমি, গায়ে হাত দেবে না। পুরনো এ শাড়িটা আমিই তাকে দান করেছিলাম। সে শাড়ি চুরি করেনি।

আমি তখন মায়ের পেছনে দাড়ানো। হঠাৎ আমার মনে হলো মায়ের লালপেড়ে শ্বেতশুভ্র শাড়ি স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছে। অলৌকিকভাবে মায়ের সেই শাড়ি যেন ভিখারিনীর সব লজ্জা আর আব্রু ঢেকে ফেলছে।

তারপর জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। তিন পতাকার তলায় অবস্থান করেছি। দেখেছি বৃটিশরাজ–পাকিস্তান–বাংলাদেশ। আমার মা–বাবা প্রয়াত হয়েছেন। আমিও জীবন সায়াহ্নে পৌছেছি। আমার বড় ছেলে শাহেদ (জ্যোতি) থাকে কানাডার মন্টৃঅল শহরে। আমি তাকে দেখতে মন্টৃঅল গিয়েছিলাম। থাকতাম তার পার্ক এক্সটেনশন এলাকার ডি–লিপির অ্যাপার্টমেন্টে।

একদিন সে ঘরে ছিল না। আমি দেখলাম তার ওয়ারড্রোবে (কাপড় রাখার আলমারি) তার মায়ের একটা পুরনো শাড়ি সযত্নে রাখা আছে। হয়তো বা সেখানকার নিঃসঙ্গ জীবনে একান্ত নির্জন মুহূর্তে নাকের কাছে শাড়ি নিয়ে সে তার মায়ের গায়ের সুবাস শোকে যেমনটি একদা আমি করতাম।

উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা থেকে

পাচ নাম্বার সুবিধা

– জীবন চৌধুরী

বছর তিনেক আগের ঘটনা আমি তখন দক্ষিণখানে থাকি। সেখানে পাশের বাসার আন্টির মেয়ের সঙ্গে আমার প্রচণ্ড ভাব হয় যাকে বলে ভালোবাসাবাসি। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে এই মনের মানুষটাকে একটা শাড়ি কিনে দেবো। সেই ইচ্ছে পূরণ করার লক্ষ্যে স্বপ্নও দেখতে লাগলাম, কবে আমার প্রিয়া আমার পক্ষ থেকে দেয়া শাড়িখানা অঙ্গে জড়িয়ে আমার পাশে বসবে আর তার কোলে মাথা রেখে ঘুমাবো।

যাক, প্রিয়াকে নিয়ে মার্কেটে গেলাম। ছয়শ টাকা দিয়ে তার পছন্দ মতো প্রাইডের একটা শাড়ি কিনে দিলাম, বাকি টাকা ঘুরে আর খেয়ে উড়িয়েছি।

দুদিন পর। বাসায় কেউ নেই। সকাল দশটা বাজে। হাতেও কোনো কাজ নেই। এই অবস্থায় শুয়ে পাকিস্তান ও নিউ জিলান্ডের মধ্যেকার একদিনের ম্যাচটা দেখছি। হঠাৎ পাশ ফিরতেই দেখি আমার প্রিয়া আমার কিনে দেয়া শাড়িটা অঙ্গে জড়িয়ে খাটের পাশে দাড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল একটা শব্দ, চমৎকার।

চমৎকার কে? আমি না শাড়ি?

আমি প্রিয়ার এই প্রশ্নে কর্ণপাত না করে উঠে বসে ওকে দেখতে লাগলাম। ওর সৌন্দর্য যেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর সে যে এতো সুন্দর আমার জানা ছিল না। তাকে বহুবার দেখেছি, আদর করছি। কিন্তু তার সৌন্দর্য পুরোপুরি অনুভব করতে পারিনি। আজ শাড়ি পরতেই তার আসল সৌন্দর্য বেরিয়ে এলো।

প্রিয়াকে ধরে এনে খাটে বসালাম। তৃষ্ণার্ত মন অনেক কিছু করতে চাইলো। তার রাঙা ঠোঁটে টোকা মেরে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রিয়া, তুমি কি জানো, মেয়েরা শাড়ি পরলে পুরুষরা কি সুবিধা পেয়ে থাকে?

সে উত্তর দিল, জানি না।

ঠিক আছে, উঠে বসো আমিই বলছি। এই বলে তার আরো কাছে গেলাম।

কয়েক মুহূর্তে পরে তার দুই গালে দুটো চুমু খেয়ে বললাম, শাড়ি পরলে নারীর আসল সৌন্দর্য বেরিয়ে পড়ে। এতো গেল এক নাম্বার। আর তুমি শাড়ি পরলে মনে হয় তুমি আমার বৌ।

এবার তার পেটে হাত বুলিয়ে বললাম, শাড়ি পরলে মেয়েদের পেট ও নাভি দেখা যায়। এতো গেল দুই নাম্বার।

তিন নাম্বারের সুবিধা হলো সহজেই বুকের পর্বত দুটোতে আরোহণ করা যায়।
প্রিয়ার বাম উরুতে একটা চাপ দিয়ে বললাম, চার নাম্বার সুবিধা হলো, সহজেই গিরিখাত এলাকায় প্রবেশ করে মুক্তা আনা যায়।
নিজেকে ছাড়িয়ে প্রিয়া উঠে পড়লো। যাবার আগে সে বলে গেল, শাড়ির আরো একটা সুবিধা হলো, এটা গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করা যায়। আর তোমাকে না পেলে আমি তাই করবো।
সেই থেকে ভয়ে আছি, আমার প্রিয়া কখন জানি শাড়ির পাচ নাম্বার সুবিধাটা কাজে লাগায়।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

জননী

– মোহাম্মদ মশিউর রহমান

১৯৭৮ সাল। বাংলা কার্তিক মাস। বিকাল চারটা এই সময়টা কারো জন্য বয়ে নিয়ে এসেছিল দুঃসহ যন্ত্রণা। তার আশা–আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সব চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দিয়েছিল এই দিন। তিন ছেলের জননী যার প্রথম ছেলে মাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ে এবং ছোট ছেলের মাত্র এক বছর বয়স। সেই নারী যার স্বপ্ন ছিল নিজের ছেলেদের তার স্বামীর সাহায্যে সুন্দর করে মানুষের মতো মানুষ করবেন। তার সেই স্বপ্ন পূরণের অঙ্কুর সহজেই বিনষ্ট হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। তার সেই সৎ সাহসী স্বামীকে সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে হত্যা করলো ১৯৭৮–এ, বাংলা কার্তিক মাসের তিন তারিখে। তার পরনের লাল শাড়ি চলে গিয়ে এলো শাদা শাড়ি। মাত্র পচিশ ত্রিশ বয়সের নারীর কাছে শাদা শাড়ির যে কি যন্ত্রণা তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানবে না। আমার প্রাণপ্রিয় বাবাকে মেরে তারা আমার মাকে করেছিল বিধবা, আমরা তিন ভাই হয়েছিলাম অনাথ।
এখানে উল্লেখ করা দরকার, আমার বাবা ছিলেন তৎকালীন মুসলিম লীগের কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার সাধারণ সম্পাদক এবং মাথাভাঙা ভৈরব হাই স্কুলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি। আমার বাবা ছিলেন সৎ, বিনয়ী ও শিক্ষিত। চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আমার বাবা প্রয়াত বাচ্চু মিয়াকে খারাপ বলবে এমন লোক পাওয়া যাবে না। হোমনা থানার চার নাম্বার মাথাভাঙা ইউনিয়নে। এমনি যারা মেরেছে তারাও বলবে না তিনি খারাপ ছিলেন। তখনকার চেয়ারম্যান টাকা দিয়ে আমার বাবাকে খুন করায়। বাবার মৃত্যুর পর মা আমাদের নিয়ে অসহায় হয়ে পরে। তার পরনের সেই শাদা শাড়ি নিয়ে আবার শুরু করে স্বপ্ন বাস্তবায়নের যেই স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন লাল শাড়িতে তার স্বামীর সঙ্গে।
স্বামীর ভিটেতে থেকেই ছেলেদের পড়ালেখা শুরু করান। বড় ছেলেকে বিএসসি মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পাঠান চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। ছেলে ফার্স্ট ক্লাস থার্ড হয়ে ফিরে আসে তার সেই মায়ের কাছে, সেই জোন অফ আর্ক এর কাছে। মা তাকে আবার পাঠায় সুদূর নিউ ইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটিতে এমএস–এর জন্য। এমএস শেষ করে আবার ফিরে আসে মায়ের কাছে। এবার মা আবার পিএইচডি–র জন্য পাঠান কানাডা–র টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে। মেজ ছেলে বিএ পাস করে

মায়ের কষ্ট দূর করার জন্য চলে যায় সুদূর প্যারিসে। ছোট ছেলেকে মা ভর্তি করান বিএসসি কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে। আমি সেই ভাগ্যবান ছেলে। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া এ বছরেই শেষ।

আমার মা ঢাকায় আমার কাছে এসে বলেন, তোকেও আমি বিদেশ পাঠাবো, পিএইচডি করাবো। আমি তোর বাবার স্বপ্নের চেয়েও বেশি কিছুই করবো।

আজকের এ অবস্থানের জন্য আমার মাকে যে কতোটা পরিশ্রম করতে হয়েছে তা শুধু আমরাই জানি। বাবা আমার মাকে আমাদের কোনো সম্পদই দিয়ে যাননি যা দিয়ে মা আরামে আমাদের পড়া চালাতে পারতো। তবে সে অগণিত মানুষের ভালোবাসা ও দোয়া দিয়ে গিয়েছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার বাবা মানুষের উপকার করে গিয়েছেন। যার জন্য আমার মা এতোটুকু আসতে পেরেছেন আমাদের নিয়ে।

আজ সাফল্যের পরেও মাকে আমরা পরাতে পারি না লাল শাড়ি। শাড়ির দোকানে গেলে আমার মায়ের জন্য আমাদের কিনতে হয় শাদা শাড়ি। এতো সাফল্যের পরেও আমরা তিন ভাই কি কখনো পারবো মায়ের লাল শাড়ি ও নাকের ফুল ফিরিয়ে দিতে? এই ভাবনায় তার তিন ছেলে তিন শহরের ব্যস্ততায় মিশে যায়।

মাথাভাঙ্গা, হোমনা, কুমিল্লা থেকে

নাম্বার ওয়ান

– নাজমা তৌফিক

পাছে হারিয়ে যাই সেই ভয়ে আমার শৈশবের খেলা সঙ্গী, কৈশোরের স্কুল পালানো বন্ধু আর যৌবনের প্রেমিক ছাত্র অবস্থায় আমাকে বিয়ে করে ফেলে। দুজনের পড়ালেখার সুবিধার্থে বাবার বাড়িতে থাকতাম। বিয়ের কয়েক মাস পরে তার এক জার্মান প্রবাসী বন্ধুসহ দেশের আরো কয়েকজন বন্ধু মিলে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যায়। কিছুদিন পর ফিরে এসে আমাকে একটি শাড়ি দেয়। ফিরোজা নীল জমিনে চওড়া সোনালি জরি পাড়ের শাড়িটি বেশ দৃষ্টিনন্দন। বিয়ের পরে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া প্রথম উপহার। আমার অতি পছন্দের পোশাক শাড়ি যা কি না তার চেয়েও পছন্দের মানুষটি দিল। আমার বুকের ভেতরে আনন্দের বন্যা শুরু হয়ে গেল। খুশিতে নেচে উঠতে চাইলাম। পারলাম না। মনে প্রশ্ন হলো, সে টাকা পেল কোথায়?

কিছু বলছি না বলে সে বললো, তোমার ফিগার ভালো, তোমাকে মানাবে। তাই এ রকম শাড়ি এনেছি। এটি সাউথ ইনডিয়ান শাড়ি। তোমার পছন্দ হয়েছে?

আড়ষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলাম, হু।

ভেবেছিলাম কিছু জিজ্ঞাসা করবো না। কিন্তু নিজস্ব ভাবনা তার নিয়ন্ত্রণ হারালো। আচমকা মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, টাকা কোথায় পেলে? প্রশ্নটা কাপা কণ্ঠে হলেও চোখ হয়ে গেল তীক্ষ্ণ। এবং আমার চোখের সামনে সে ম্রিয়মান হয়ে গেল।

মিন মিন করে যা বললো তার অর্থ হলো, তার বাবা অর্থাৎ আমার শ্বশুর টাকা দিয়েছেন। ঠিক বিশ্বাস হলো না। আর কিছু জিজ্ঞাসা করে তাকে বিব্রত করতে চাইলাম না। তবে মন হলো অশান্ত। কোথা থেকে টাকা এলো? এই প্রশ্ন আমাকে কুড়ে কুড়ে খেতে শুরু করলো। ফলে অনেক অনুষ্ঠানে ছোট বোনের ধার দেয়া শাড়ি পরে গিয়েছি। কিন্তু স্বামীর আনা শাড়িটি পরিনি।

কয়েক বছর পর আমার স্বামী মোটামুটি ব্যবসা জমিয়ে ফেলে। একদিন ফেলে আসা দিনের সুখ–দুঃখের স্মৃতি ঘাটছিলাম। তখন ভারত ভ্রমণের গল্পে জানালো তার শাড়ি কেনার রহস্য।

কলকাতায় দিনে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে রাতটা এক বন্ধুর খালার বাড়িতে অনেক কষ্টে কোনো রকমে থাকতো। এভাবে হোটেল ভাড়া বাচিয়ে শাড়িটি কেনার কথা জানলাম। আরো শুনলাম এভাবে টাকা বাচিয়ে শাড়ি কেনার জন্য বন্ধুদের নির্মম উপহাসের কাহিনী। তার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে গেলাম। আত্মগ্লানিতে ছেয়ে গেল হৃদয়। কারণ আমি ভেবেছিলাম, জার্মান প্রবাসী বন্ধুর দেয়া টাকায় শাড়িটি কেনা হয়েছিল যা কি না আমার কাছে ভিক্ষার শামিল।

এতো বড় ভালোবাসার সামনে অহংকারী স্ত্রী হয়ে নিষ্ঠুর আনন্দে আনন্দিত হতে পারলাম না। কিন্তু মনে হলো, বিশ্বে প্রেমিকদের যদি কোনো তালিকা থাকে তাহলে আমার স্বামীর অবস্থান এক নাম্বারে।

পার হলো আরো কিছু বছর। গড়িয়ে গেল অনেক সময়। ঘুরেছি বেশ, কিনেছি অনেক যার মধ্যে শাড়িই প্রধান। সময়ের ব্যবধানে দেয়াল জোড়া আলমারিতে এখন শাড়ির সমাহার যা কি না আর্থিক অবস্থার সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বন্ধুরা বলে বিলাসিতা। কথায় বলে, প্রথম বিয়ের মতো আর দ্বিতীয়টি হয় না। অর্থাৎ প্রথম স্বামী বা প্রথম স্ত্রীর মতো আর দ্বিতীয়টি হয় না। আমার জীবনে এটি সত্যি হয়েছে। সুপ্রিয় পাঠক, ভুল বুঝবেন না। স্বামী নয়, শাড়ির ক্ষেত্রে এই প্রবাদ সত্যি হয়েছে।

পারিবারিক জীবনে যখন কোনো ঝামেলায় পড়ে অস্থির হয়েছি, দাম্পত্য জীবনের কোলাহলে যখন দিশেহারা হয়েছি, পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য যখন বিষের মতো মনে হয়েছে, জীবন হয়ে উঠেছে অর্থহীন, ভুগেছি অনেক অস্থির সিদ্ধান্তে, সেসব সময়ে আমাকে সুস্থির হতে সাহায্য করেছে আমার স্বামীর দেয়া সেই চওড়া সোনালি পাড়ের ফিরোজা নীল শাড়িটি। এসব টালমাটাল অবস্থায় যখনই শাড়িটি ছুঁয়েছি ঠিক তখনই অদ্ভুতভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছি। শাড়ি যেন আমার কানে ফিশ ফিশ করে বলছে, অস্থির হয়ো না সোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার শরীর, মন বিবশ হয়ে যায়। ফিরে আসি আমার পারিবারিক সুখের ভুবনে।

হয়তো এভাবেই এ শাড়ি সারা জীবন আমার দুঃসময়ের পরম বন্ধু হয়ে আমাকে সান্ত্বনা দেবে। আমার আজন্মের প্রেমিক স্বামী যার সঙ্গে বার বার নতুন করে রচিত হবে ভালোবাসার সেতুবন্ধন।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

সাধ

– রহিমা খাতুন

আমার বয়স এখন চৌষট্টি। হারানো দিনের ছোটবড় অনেক স্মৃতির মাঝে প্রথম শাড়ি কেনার বিড়ম্বনা, আনন্দ এবং হতাশার কথা মনে পড়ে। বয়স তখন সাত কি আট বছর হবে। আমার বয়সী বা তার চেয়ে একটু বড় একটা মেয়েকে গাঢ় বেগুনি রঙয়ের শাড়ি পরিহিতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। এবং তখনই মনে মনে সংকল্প করি আমারও হুবহু এ রকম একটা শাড়ি চাই। প্রসঙ্গত বলা যায়, তখন অনেক ছোট মেয়েরাও শাড়ি পরতো যদিও আমাদের পরিবারে অতো ছোট মেয়েরা শাড়ি পরতো না। আমার আব্বা ছিলেন তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষিত লোক। বৃটিশ আমলের লোক। তাই বৃটিশ ভাবধারা ওনার মধ্যে ছিল। পোশাক–আশাকে বা অলঙ্করণে ইংরেজ মহিলাদের উদাহরণ খুব দিতেন। কিন্তু আমরা ছিলাম ওনার খুব আদরের। তাই ভরসা ছিল ওনার কাছে আবদার করলে নিশ্চয়ই আমাকে আমার পছন্দের শাড়ি কিনে দেবেন।

আমার বোনদেরকে আমার ইচ্ছার কথা জানালাম। ওরা তো হেসেই খুন। যাই হোক। বাবার কাছে আমার খায়েশের কথা জানালাম। তিনি শুনে এটাকে আমার পাগলামিই মনে করলেন। আমিও নাছোড়বান্দা। প্রতিদিন বিকেলে আব্বা ভলিবল খেলতেন। আমিও অপেক্ষা করতাম কখন খেলা শেষ হবে, আব্বাকে কখন পাকড়াও করবো। খেলা শেষে আব্বাকে গিয়ে ধরতাম, আমাকে মিষ্টির দোকানে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি খাইয়ে পিওন দিয়ে তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। আমি হাল ছাড়িনি। রুটিন মতো প্রত্যেকদিন হাজিরা দিয়ে আমার বায়না জানান দিতাম।

প্রথম প্রথম আব্বা জামা কিনে দিতে বলতেন। পরে শাড়ি কিনে দেবেন বলে নিমরাজি হলেন। আমিও দৃঢ়সংকল্প, আমার শাড়ি চাই–ই। কারণ আমার চোখের সামনে যখন তখন বেগুনি শাড়িটা ভাসে। আজ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শাড়ি না নিয়ে বাড়ি যাবো না। আজ মিষ্টি খাইয়েও আমাকে আর ভোলাতে পারলেন না। আমাকে অনেক অনুরোধ করলেন বাড়ি ফিরে যেতে। তিনি একটা সুন্দর শাড়ি কিনে দেবেন। কিন্তু আমি যাবোই না। শেষে আমাকে নিয়ে তিনি দোকানে গেলেন। এ দোকান, সে দোকান, কোনো শাড়িই আমার পছন্দ হয় না।

শেষ পর্যন্ত গলির ভেতরে এক দোকানে আমার পছন্দের শাড়ি পাওয়া গেল। শাড়িটা আব্বার পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু আমি মহাখুশি। অবশেষে সম্ভবত আড়াই টাকা দিয়ে শাড়িটা কেনা হয়েছিল এবং আমি বগলদাবা করে বাড়ির দিকে রওনা হই। অবশ্য আব্বাকে সঙ্গে নিয়ে। এখানে বলে রাখি, আমার আম্মার শাসন ছিল অত্যন্ত কড়া। আজানের সঙ্গে সঙ্গে সবাই পড়ার টেবিলে হাজির হতে হতো। ওনার আরো অনেক নিয়ম–কানুন ছিল যা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম। এখন তো অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আমার তো আত্মারাম খাচাছাড়া। ভরসা আব্বা। শাড়ি পাওয়ার আনন্দে তো এতোক্ষণ বিভোর ছিলাম। এখন তো মহাবিপদ। আব্বা আমাকে নিয়ে বাড়ি রওনা হলেন। বাড়ির কাছাকাছি আমার এক কাজিনকে পেয়ে ওনার সঙ্গে আমাকে দিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন

যে, আমি এতোক্ষণ আব্বার সঙ্গে ছিলাম। আব্বা দেরি করে দিয়েছেন। আমাকে যেন কোনো রকম শাসন করা না হয়।

মাগরিবের নামাজের পরে আম্মা অনেকক্ষণ জায়নামাজে থাকতেন আলাদা একটা রুমে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি পড়ার টেবিলে বসে পড়লাম। আর আতংকের মধ্যে ছিলাম কখন আম্মা এসে হাজির হয়ে আমাকে শাস্তি দেন। নয়টা আমাদের খাবার সময়। আম্মা সবাইকে খেতে ডাকলেন।

আমি ভয়ে খাচ্ছিলাম না। কিন্তু বার বার সবাইকে খেতে ডাকলেন। ভয়ে ভয়ে খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লাম। অন্যদিন আম্মা আমাদের পড়ার তদারকির জন্য দুই একবার আমাদের পড়ার টেবিলে আসতেন। আজ সম্ভবত আমাকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য একবারও আসেননি পড়ার টেবিলে বা কোনো জবাবদিহিও করেননি। সম্ভবত আব্বা পেয়াদা মারফতে আবারও আমাকে শাস্তি না দেয়ার জন্য খবর পাঠিয়েছেন।

যা হোক, শোয়ার পর শংকা এবং আনন্দে ঘুম আসছে না। যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নের দেখলাম, শাড়ি পরে স্কুলে গিয়েছি, সহপাঠীরা আমার শাড়ি দেখে মুগ্ধ।

পথের লোকেরা আমার শাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে আর বলছে, বাহ! মেয়েটা কি সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। যেখানে যাই, সবাই আমার শাড়ির প্রশংসা করেছে। কেউ নিয়ে যেতে চাইছে। আমি শক্ত করে শাড়ি ধরে রেখেছি এবং দেবো না, দেবো না, বলছি।

সকালেও আম্মা সহজে সামনে এলেন না। সেদিন স্কুল বন্ধ ছিল। বাসায় ছিলাম। আফসোস ছিল, শাড়ি পরে এখনো কাউকে দেখতে পারলাম না। যাহোক, সকাল দশটার দিকে আম্মা আমার বড় বোনকে ডেকে বললেন আমার শাড়িটা নিয়ে যেতে।

আমি তো খুশিতে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে রইলাম আম্মার প্রশংসা শোনার জন্য। কিন্তু যেন বজ্রপাত হলো যখন আম্মা বললেন, এটা কি শাড়ি! ছিঃ, এই শাড়ি কেনার জন্য এতোদিন এতো হয়রান। এটা তো যোগীদের শাড়ি।

যোগী মানে আমাদের অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের বলতো। সবাই মিলে হাসাহাসি করলো। উবে গেল কর্পূরের মতো আমার সব সাধ, আহ্লাদ, আনন্দ, উত্তেজনা। চোখের পানিতে বুক ভেসে গেল। আর কোনোদিন শাড়িটা পরা হয়নি।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

সেই দিন

– রজনীগন্ধা

বেশ কিছুদিন আগেও আমার কল্পনার প্রধান বিষয় ছিল ঘোমটা দিয়ে বিয়ের লাল শাড়ি পরে বাসর রাতে আমার প্রিয়তম যার জন্য এতোটা বছর নিঃসঙ্গভাবে পাড়ি দিয়ে এসেছি তার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসার ডালি নিয়ে অপেক্ষা করছি। কতো কথা যে তাকে বলতাম আর কতোবারই যে মনে মনে বধূ হয়েছি সেটার হিসাব দিতে পারবো না। কিন্তু ইদানীং আমার সমস্ত কল্পনাই যেন

নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ বিষয় নিয়ে কোনো ভাবনাই ভাবি না এবং ভাবতেও পারি না ভয়ে। আমার সমস্ত আশাই যেন খান খান হয়ে যায় বার বার। সেই সঙ্গেও যেন সুন্দর কল্পনায় বিভোর মনটাও ভেঙে যায়।

দিন তারিখ পাকা হওয়ার পর এ পর্যন্ত মোট চারবার আমার বিয়ে ভেঙে গিয়েছে। প্রতিবারই আমার কাছে অজ্ঞাত থেকে যায় আমার কি দোষ আর কেনই বা এমন হয়। জীবনে বহুবার পাত্র বা পাত্রপক্ষের সামনে গেলেও একজনের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে যাকে কি না এ যুগের দশটা ছেলের চেয়ে আলাদা এবং আমার সঙ্গে তার আলোচনার বিশেষ সুযোগ হওয়ায়। এই বিশেষ আলোচনার পরীক্ষায় ১০০% নাম্বার দিয়েছিলাম। আল্লাহকে মনে মনে এতো ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম যে, আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই তিনি এ রকম একটা ছেলের সঙ্গে চিরজীবনের বন্ধন সৃষ্টি করছেন। কিন্তু আমার এ আশা বা স্বপ্ন কোনোটাই বাস্তবে রূপ নেয়নি।

এটাও জানি না, আমার জীবনের সেই কাঙ্ক্ষিত বাসর রাত কবে আসবে? আদৌ আসবে কি না সেটাও জানি না।

আমার ভেতরে একটা অব্যক্ত বেদনায় ধুকে ধুকে মরছি। মাকেও দেখি আমার এই অবস্থা দেখে চিন্তা করতে। জায়নামাজে বসে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে। মায়ের মনে সব সময়ই আমার ভাবনা। অনেক সময় তো বলেই ফেলেন, তোর কি হবে! তোকে একটা ভালো ছেলের হাতে তুলে দিতে পারলেই আমি শান্তি পাই। তাছাড়া তো আমি মরে গিয়েও শান্তি পাবো না। আল্লাহ তো সকলের মনের অবস্থাই জানে। তাই আমিও বলি, হে আল্লাহ! আমি আর কিছুই চাই না তোমার কাছে শুধু আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে তাকে সুস্থ রাখার জন্য অন্তত আমাকে একটি বিয়ে দিয়ে দাও যাতে আমার সুখ তিনি দেখতে পারেন।

শাড়ি পরার অভ্যাস তেমন নেই। তবে পরতে ইচ্ছা করে মাঝে মধ্যে সেই প্রিয় শাড়িটা, যে শাড়িটা আমাকে সঙ্গে নিয়েই আমার বিয়ে উপলক্ষে মা কিনেছিলেন। আজ পর্যন্ত অবশ্য পরা হয়নি, এমনকি ভাজটাও খোলা হয়নি। আলমারিতেই তুলে রাখা আছে। আলমারি খুললেই চোখে পড়ে যায় শাড়িটা। দেখলেই কষ্ট পাই ভীষণ। কান্নাকেও যেন বাধ মানাতে পারি না। সে জন্য একটু নেড়েচেড়ে আবারও রেখে দিই সুন্দর করে। যতোদিন পর্যন্ত না সেই কাঙ্ক্ষিত দিন না আসে ততোদিন হয়তো আমার দিনগুলো এভাবেই কেটে যাবে। হয়তো আমার পরাও হবে না সেই শাড়িটা।

ঠিকানাবিহীন

লাইলি–মজনু

– ফিরোজ আহাম্মেদ

আমরা দুই বন্ধু। একই গ্রামে আমাদের বাড়ি যদিও আগে বন্ধুর সঙ্গে তেমন একটা পরিচয় ছিল না। প্রাইমারি ছেড়ে হাই স্কুলে এসে দুইজনের মাঝে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গ্রামের মধ্যে

আমাদের দুই বন্ধুর যথেষ্ট সুনাম আছে। ছেলে–বুড়ো, নারী–পুরুষ সকলেই আমাদের বলে জোড়ামানিক।

হাই স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর আমার বন্ধু আবিষ্কার করলো, হাই স্কুল পড়ুয়া একটি গ্রাম মেয়ের নাম রেখা। মেয়েটি খুব বেশি সুন্দরী না হলেও তার রসে ভরপুর উদ্দীপ্ত যৌবনখানা চোখে লাগার মতো।

আমরা কলেজে যাই–আসি, মাঝ পথে প্রায়ই মেয়েটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। দুই বন্ধু দূর থেকে ভাবি, আজ কিছু একটা তাকে বললো। কিন্তু মেয়েটি কাছে এলে ভয়ে বুকটা দুরু দুরু কাপতে থাকে। আর কিছুই বলা হয় না। সে আমাদের হাবভাব দেখে একটু মুচকি হেসে পাশ দিয়ে চলে যায়।

এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলে যেতে লাগলো। একদিন কিছু দোয়া দরুদ পড়ে, মনে খুব সাহস সঞ্চয় করে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, তুমি শুধু সুন্দরীই নও, রক্ত রাঙা গোলাপ। মেয়েটি আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল।

বন্ধু আধা কিলোমিটার দূরে দাড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

এই ভেবে আজ একটু, কাল একটু বলতে বলতে মেয়েটির সঙ্গে প্রেম প্রেম ভাব জমে উঠেছে। এখন আর কথা বলতে তেমন একটা ভয় লাগে না। মেয়েটিও সবেমাত্র অ আ বলা শুরু করেছে।

রেখা নামটি গ্রামের সকলেরই পরিচিত। তাই একদিন পথের মাঝে মেয়েটিকে ডেকে বললাম, রেখা, আজ থেকে তোমাকে লাইলি বলে ডাকবো যেন কেউ বুঝতে না পারে তোমাকে ডাকছি।

সে বললো, ওরে আমার মজনু, এতোই যদি সাধ জাগে তোমার মনে তাহলে লাইলি বলে একবার ডেকে দেখো না। বলেই সে একটু মিষ্টি হেসে চলে গেল।

গ্রামীণ রাজনীতির কারণে বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। লাইলির সঙ্গে দেখা করতেও তেমন একটা ইচ্ছা হয় না। এখন যে যার মতো একা। প্রায়ই মাঝে মাঝে গ্রামে পুলিশ আসে। এই পরিস্থিতির মধ্যে একদিন বিকেলে লাইলির বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি লাইলি। ওড়নার এক প্রান্ত মাথার ওপর দিয়ে মুখ ঢেকে আমার সামনে এসে হাজির। তাকে দেখে বলে বসলাম, লাইলি, তুমি যদি শাড়ি পরে বৌ সাজো খুব সুন্দর লাগবে।

আমার কথা শুনে লাইলি বললো, একটা শাড়ি কিনে দিও, বৌ সেজে দেখাবো, বলেই সে দ্রুত চলে গেল।

তার গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আমার গন্তব্যের দিকে রওনা হলাম।

কয়েকদিন পর লাইলির জন্য একটা শাড়ি কিনে সন্ধ্যার একটু আগে তাদের বাড়ির কাছে এসে লাইলি বলে ডাক দিতেই সে বাড়ির বাইরে এসে দাড়ালো। বললাম, লাইলি, কাছে এসো, কথা আছে।

সে আমাকে ইশারায় বাড়ির পেছনের দিকে যেতে বললো।

তার কথা মতো সেখানে চলে গেলাম।

লাইলি কাছে আসতেই তার হাতে শাড়িখানা দিয়ে বুকের সঙ্গে একটু জড়িয়ে ধরতেই সে বাধা দিয়ে বললো, আজ না। আগামীকাল ঠিক এই সময় তুমি এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করো। তখন বাড়িতে কেউ থাকবে না।

খুশিতে আত্মহারা হয়ে লাইলিকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম।

পরের দিন দুপুরে ডাক পিওন এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠির খাম ছিড়ে কাগজখানা বের করে পড়ে দেখি আমার চাকরি হয়ে গেছে এবং এক্ষুণি আমাকে রওনা দিতে হবে।

বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই দিন বিকেলে খুলনাতে চলে আসি এবং পরের দিন চাকরিতে যোগদান করি।

খুলনা থেকে

তাজমহল

– রীতা ইসলাম

১৯৯৭ সালে বেড়াতে গিয়েছিলাম ভারতে। আমার সঙ্গে ছিল আমার স্বামী, আমার ভাই ও ভাবী। দিল্লি, জয়পুর, আজমীর ঘুরে পৌছালাম আগ্রায়। ভাবী আর আমি আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম তাজমহলে যখন যাবো তখন আমরা দুইজন শাড়ি পরবো এবং ভাইয়া ও আমার স্বামী পরবে পাঞ্জাবি–পায়জামা।

দুপুরে খেয়ে–দেয়ে তাজমহল দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পরলাম। এবং দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে আমি বাসন্তী রঙের জর্জেট শাড়ি আর ভাবী নীল রঙের সিল্ক শাড়ি পরে তাজমহলে পৌছালাম। সত্যিই তাজমহল দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরার পর কয়েকজন বিদেশি আমাদের কাছে এসে ইংরেজিতে বললো, যদি কিছু মনে না করো, তোমাদের সঙ্গে আমরা কয়েকটা ছবি তুলবো।

অনেকটা বিস্ময় নিয়েই সম্মতি দিয়ে দিলাম।

আমাদের সঙ্গে তারা বেশ কয়েকটা ছবি তুললো। যাবার সময় বললো, তোমার ড্রেসটা আমাদের খুব ভালো লেগেছে।

মনের অজান্তেই নিজের শাড়িটার দিকে তাকালাম। এতোক্ষণ পরে ছবি তোলার রহস্য বুঝতে পারলাম। আসলে আমার শাড়িটায় কাচের পুতির যে কাজ করা ছিল, রোদের আলোতে এতো চমকাচ্ছিল যে, বিদেশিরা আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। শাড়ির গল্প এখানেই শেষ নয়।

তাজমহল ঘুরে বের হওয়ার জন্য গেটের কাছে দাড়িয়ে শেষবারের মতো তাজমহলের দিকে তাকিয়েছিলাম। ভাইয়া বললেন, দাড়াও শেষ ছবিটা তুলে দেই।

ভাইয়া ছবি তুললেন। এরপর কয়েকটা ইনডিয়ান মেয়ে এসে বললো, তোমার শাড়িটা এতো চমৎকার লাগছে, একটা ছবি তুলতে পারি কি? এবার অনেকটা উৎসাহ আর আনন্দে নিয়ে নিজেকে মডেল হিসেবে দাড় করালাম।

এরপর ছোট্ট একটি বাচ্চা এলো আমার সঙ্গে ছবি তুলতে। সে হয়তো শাড়ি দেখে নয়, সবাই আমার ছবি তুলছে দেখে হুজুগে পড়েই ছবি তুলতে এসেছিল। যাই হোক। গেটের কাছে এভাবে দাড়িয়ে একই জায়গায় পাচটা ক্যামেরায় আমার ছবি বন্দী হলো। তারপর অনেকটা লজ্জা নিয়েই তাজমহলের গেট পার হলাম।

গাড়িতে বসে ভাবছিলাম আমার শাড়িতে কি এমন বিশেষত্ব আছে যে, সবাই এভাবে আকৃষ্ট হলো! আসলে মনে হয় শ্বেতপাথরের তাজমহল, বাসন্তী শাড়ি, কাচের পুতির ওপর রোদের ঝলকানি সব কিছু মিলিয়ে এমন কিছুর সৃষ্টি হয়েছিল যে, হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে কিছু মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

খুলনা থেকে

ড্রেস হার্ট সার্জারি

– শিল্পী

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। রোকেয়া হলে থাকি। এবার পূজাতে শাড়ি নেবো বলে বাড়ি থেকে এক হাজার টাকা বেশি আনি। হলে আসার পর আমার মনে হয় এবার ওকে (আমার ইয়ে!) তো পাঞ্জাবি দেয়ার কথা। দুজনে কমপ্রোমাইজ করি। আমি পাঞ্জাবি দেবো, ও আমাকে শাড়ি কিনে দেবে।

যেই কথা সেই কাজ। বারোশ টাকায় আড়ং থেকে পাঞ্জাবি কিনে দিই। ও আমাকে নিয়ে চলে ইস্টার্ন প্লাজায়, ময়ূরীতে। আমাদের বাজেট বারো থেকে পনেরোশ।

সেলসম্যানগুলো একবার আপা একবার ভাবী বলছে। আমার ইয়ে তো এমনিতেই একটু লাজুক। আরো বেশি লজ্জায় লাল হচ্ছে আমাকে ভাবী ডাকার পর। আমারও একটু একটু লজ্জা লাগছিল! সবগুলো কাপড় দেখিয়ে বলে এটা নেন মানাবে ওটা নেন ভালো হবে, এসব।

শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একটা জামদানি নিয়ে বিদায় হই আমরা। যখন দুজন রিকশায় ফিরি তখন ও বললো, দেখলে তো, দোকানি কেমন করে তোমার ওপেন হার্ট সার্জারি করে সব জেনে গেল।

আমি বললাম, তুমি তো এখন আমাকে *ড্রেস হার্ট সার্জারি* করছো।

যাঃ দুষ্টু কোথাকার!

ঢাকা থেকে

অনভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ

– মোহাম্মদ ওমর ফারুক দোলা

মুসলিম গার্লস স্কুলের সামনের মোড়ে *গীতিগুঞ্জ* নামের স্টেশনারি দোকানটার পাশে দাড়িয়ে আছি। আমার হাতের লাল গোলাপটাকে যতোটুকু সম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করছি। মাঝে মধ্যে এদিক–সেদিক তাকাচ্ছি। কেউ না আবার দেখে ফেলে! বন্ধুদের কেউ দেখলে তো মান ইজ্জতের বারোটা বাজবে। অনার্স থার্ড ইয়ারের ছাত্রের পক্ষে গার্লস স্কুলের সামনে দাড়িয়ে থাকা সত্যিই বেমানান। আর সেই বেমানান কাজটাই করছি।

আজ স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থিনীদের ফেয়ারওয়েল। মধ্যস্থতাকারীর কথা অনুযায়ী এগারোটায় গীতিগুঞ্জের সামনে জলি থাকবে। যেহেতু ক্লাস নেই, তাই ইউনিফর্ম ছাড়াই সে স্কুলে আসবে। এখানে এলেই সিদ্ধান্ত নেবো কোথায় ঘুরতে যাবো। আজই আমাদের প্রথম ডেট।

এগারোটার পাচ মিনিট আগেই সখি পরিবেষ্টিত রাজকন্যার আগমন। সখিদের বিভিন্ন টিপ্পনি ও অকারণ হাসি সহ্য করেও কোনোমতে দাড়িয়ে আছি। রাজকন্যাও অবনত মস্তকে দাড়িয়ে। হঠাৎ এক সখির জবান খুললো।

আমি মণি, এদের নাম সিফাত, রুমা, তন্দ্রা ও স্মৃতি। আমাদের হাতে আইসকৃম খাওয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকার একটি নোট গুজে দিন, কেটে পড়ি। তারপর আপনারা চলে যান যেখানে খুশি।... তাড়াতাড়ি করুন। দেরি হলে আপনাদেরই ক্ষতি।

নিজের মহত্ত্ব জাহির করতে এবং যুগপৎ রাজকন্যার মুখ রাখতে তাদের নিরাশ করিনি।

রিকশা নিয়ে সরাসরি চলে গেলাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিকাল গার্ডেনে। একটি ইউক্যালিপটাস গাছের নিচে বসে লাল গোলাপটা তার হাতে দিয়ে গল্প করছি এবং তাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছি। সে জর্জেট শাড়ি পড়েছে। নীল রঙের মাঝে হালকা পৃন্ট। অপূর্ব লাগছে। সেই সঙ্গে আমাদের দুইজনের বয়সের তফাতটাও যেন উহ্য হয়ে গেল। শাড়ি পরা এ মেয়েকে দেখলে কে বলবে সে ক্লাস নাইনের ছাত্রী! বন্ধুদের কাছে তাকে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার বা ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী বলে নির্ঘাত চালিয়ে দেয়া যাবে। এ ব্যাপারে অবশ্য তার বয়সের তুলনায় একটু বেশি বাড়ন্ত শরীরটাও আমাকে হেলপ করবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। এবার ওঠার পালা। গল্পের সমাপ্তি টেনে উঠতে যাবো এমন সময়ই ঘটলো বিপত্তি। জলি বসা থেকে উঠে ঠিক নাভিটার কাছে বাম হাত চেপে ধরে বসে পড়লো।

আমি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলো?

শাড়ি খুলে গেছে। লজ্জাবনত মুখে তার সংক্ষিপ্ত জবাব।

তাতে কি হয়েছে? পরে নাও। এই জায়গাটা মোটামুটি নির্জন। আশপাশে কেউ নেই।

সে চুপচাপ বসে আছে। চোখে পানি টলমল করছে। ভাবলাম, আমার সামনে শাড়ি পরতে সে লজ্জা পাচ্ছে। তাই উল্টো দিকে মুখ করে দাড়িয়ে বললাম, এবার হলো? আমি তাকাবো না। তুমি পরে নাও।

কয়েক মিনিট পার হলো। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আড়চোখে পেছনে তাকালাম। জলি ঠাই বসে আছে। চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। আমি ঘুরে তার মুখোমুখি হলাম। এতে কান্নার কি হলো? বোকার মতো কাদছো কেন? শাড়িটা পরে নিলেই তো হয়।

এবার সে ফুপিয়ে কাদতে লাগলো। কান্না জড়ানো কণ্ঠে বললো, আমি শাড়ি পরতে পারি না। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে ফুপি পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ছোটখাটো একটা শক খেলাম। এ্যা। বলে কি এই মেয়ে! এখন কি হবে? তার পাশে বসে সাতপাচ ভাবতে লাগলাম। আশপাশে বয়স্ক গোছের কোনো মহিলাকেও দেখছি না যে, এ বিপদ থেকে মুক্তি পাবো। সত্যি বলতে কি, গার্ডেনের নির্জন জায়গাগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া বয়স্ক কেউ তেমন একটা আসেন না।

হঠাৎ নীরবতা ভাঙে তার প্রশ্নে। আপনি শাড়ি পরাতে পারেন না?

ভেবে পাচ্ছি না তাকে কি বলবো।

কি হলো, কথা বলছে না কেন?

না, পারি না।

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন শাড়ি পরাতে না পারা একটি মস্তবড় অপরাধ।

তারপর বহু কষ্টে তাকে রাজি করালাম। নাভির কাছে শাড়ির কুচির উৎসমূলে ধরে ধরে সে রাস্তা পর্যন্ত এলো। মূল রাস্তায় এসে একটা রিকশা পেয়ে হাপ ছেড়ে বাচলাম।

শূন্য আমার একমাত্র মেয়ে। বয়স সাত। এ বয়সেই তার অর্জনের হিসাব কষলে বাবা হয়েও তাকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছা হয়। শহরের প্রায় প্রতিটা মানুষের মুখে মুখে ফেরে তার নাম। সর্বমহলেই সে এক নামে পরিচিত। পহেলা বৈশাখ, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলই ডিসেম্বর, একুশে ফেব্রুয়ারিসহ যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠানেই শূন্যের নাচ যেন অপরিহার্য। একবার তো তার অসুস্থতার জন্য বেশ বড় ধরনের একটি প্রোগ্রাম এক সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। রাস্তায় বের হলে ছোট ছেলেমেয়েরা যখন আমার দিকে আঙুল তুলে বলাবলি করে, ওই যে শূন্যের বাবা যাচ্ছেন তখন গর্বে বুকটা সত্যিই ভরে ওঠে।

শূন্যের এ কৃতিত্বের নেপথ্যে যার অবদান সবচেয়ে বেশি সে হলো আমার স্ত্রী। সাংসারিক শত ঝামেলার মাঝেও শূন্যকে নাচের টিচারের কাছে নিয়ে যাওয়া, তার পড়াশোনার খোজখবর রাখা সবই তাকে মেইনটেন করতে হয়। কোন নাচের জন্য কোন পোশাকটা মানাবে, কোন নাচের শাড়িটা কিভাবে পরতে হবে তা সে খুব ভালো বোঝে। শাড়ি পরা বা পরানোতে আমার স্ত্রীর একটা আলাদা সুনাম আছে।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরি কিংবা পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ র‌্যালিতে অংশ নেয় মহল্লার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও। ওই দিনগুলোতে খুব ভোরে মেয়েরা এসে ভিড় জমায় আমার স্ত্রীর কাছে। তারা যখন আমার স্ত্রীর কাছে এসে বায়না ধরে, আন্টি, আমার শাড়িটা আগে পরিয়ে দাও তখন আমি মুচকি হাসি। সে যখন ধৈর্যের সঙ্গে পরম মমতায় তাদের প্রত্যেককে শাড়ি পরিয়ে দেয় তখন আমার মস্তিষ্কের অলিগলির কিছু স্মৃতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ভাবি, ওতো সেই জলি, প্রথম ডেট করতে গিয়ে যার শাড়ি খুলে গিয়েছিল। কি কাণ্ডটাই না সে করেছিলো! মনের অজান্তেই হেসে উঠি।

ময়মনসিংহ থেকে

সুইট হার্ট

– পুতুল

আমার বিয়ে হলো গত বছর। আমার হাজব্যান্ড তখন সবেমাত্র চাকরিতে ঢুকেছে। তাই ইচ্ছে মতো শখের জিনিস কেনা হয়ে উঠতো না। তারপরও সে খুব চেষ্টা করতো আমার ইচ্ছেগুলো পূরণ করার। গত বছরের *শিল্প পণ্য মেলা*–র একটি স্টলে অদ্ভুত সুন্দর একটি শাড়ি আমার নজর কাড়ে। কালো নেটের ওপর পুরো শাড়ি জুড়ে কালো সুতার এমব্রয়ডারি আর মাল্টিকালার পুতির কাজ। এতোই

জমকালো একটি শাড়ি থেকে চোখ কিছুতেই সরতে চাইলো না। দাম জিজ্ঞাসা করলাম। দোকানি বললো চার হাজার।

মনটা খারাপ হয়ে গেল দাম শুনে, এতোগুলো টাকা ফেলে দেয়ার কোনো মানে হয় না। এদিকে দোকানিও দাম কমাবে না। শাড়িটাকে বার বার ধরে দেখলাম। দোকান থেকে বের হয়ে আসার পরও পেছন ফিরে দেখছিলাম চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছিল না। এরপর আরেক দিন পর আবার গেলাম দোকানটায় এই ভেবে যদি দাম একটু কমায়। গিয়ে যখন আবার দাম জিজ্ঞাসা করলাম। দোকানি জবাব দিল ছয় হাজার। শুনে তো আক্কেল গুড়ুম। অগত্যা কি আর করা! চলে এলাম। কিন্তু শাড়িটি আমার মনে গাথা হয়ে গেল।

এরপর তিন চার মাস পর আমার হাজব্যান্ড ইপিজেড-এর একটি কম্পানিতে জয়েন করলো। প্রথম মাসের বেতনটা সে আমার হাতে দিয়ে বললো, তুমি যেভাবে ইচ্ছে খরচ করো।

খুশিতে ঝলমল করছিলাম আর প্রথমেই যে চিন্তাটা আমার মাথায় এলো তা হলো সেই কালো শাড়িটি। শাড়ির নাম জানা ছিল না, মার্কেটে গিয়ে দোকানিকে বর্ণনা দিতেই বের করে দিল। শাড়িটি কিনতে পেরে ভীষণ আনন্দ হয়েছিল। এখনো মাঝে মধ্যে আলমারি থেকে বের করে শাড়িটি ছুয়ে দেখি।

আমরা দুই মাস পর সউদি আরব চলে যাচ্ছি। আমার হাজব্যান্ড ওখানে সরকারি চাকরি পেয়েছে। বেতন অনেক। ইচ্ছে করলে এখন থেকে অনেক রকমের শাড়ি কেনা যাবে। কিন্তু বিয়ের পর প্রথম শখ করে হাজব্যান্ড-এর বেতনে পছন্দের শাড়িটি কেনার যে সুখের অনুভূতি সেই স্মৃতি সারা জীবন আমার মনে গেথে থাকবে।

Thanks sweetheart...,Thanks for everything.

চট্টগ্রাম থেকে

সংগ্রামী

– মণি বেগম

আমার বিয়ে হয় ১৯৭৮ সালে বড়লোকের এক মাত্র বেকার ছেলের সঙ্গে। বাবা, মা খুব ধুমধাম করে আমার বিয়ে দেন যাতে তাদের মেয়ে সুখে-শান্তিতে স্বামীর সংসার করতে পারে। কিন্তু বিয়ের ছয় মাসের মাথায় বুঝতে পারলাম আমার স্বামী নামে পুরুষটির শুধু ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই তার দেয়ার ক্ষমতা নেই। এই ছয় মাসের মধ্যে একটা শাড়ি তো দূরের কথা, শখ করে এক গজ চুল বাধার ফিতাও এনে দিতে পারেনি। তবে তার ভালোবাসা এতো গভীর ছিল যে, কোনো কিছু না পেলেও তার ভালোবাসায় ভুলে থাকতাম না পাওয়ার কষ্ট।

বিয়ের সময় বাবা, মায়ের দেয়া শাড়িগুলো ছিড়ে যাওয়ায় সেগুলো পরার মতো অবস্থা যখন আর নেই, তখন একদিন আমার স্বামীকে বললাম, আমার সব শাড়ি ছিড়ে গিয়েছে, পরার মতো অন্য কোনো শাড়ি নেই।

সে কোনো কথা বললো না। পরের দিন তার এক বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করে একটা সুন্দর শাড়ি আনলো। আমার সে কি আনন্দ! রাতে সেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিলাম।

সকালে যখন গোসল করে নতুন শাড়ি পরে সংসারের কাজে ব্যস্ত তখন সকালের নাশতা তৈরি নিয়ে শুরু হলো আমার শাশুড়ির কথা কাটাকাটি। এক পর্যায়ে বাশের কঞ্চি দিয়ে আমাকে মারা শুরু করলেন। বাশের কঞ্চি লেগে পরনের নতুন শাড়িটা ছিড়ে গেল। তখন আমি যে কি কষ্ট পেলাম বোঝাতে পারবো না। কাদতে কাদতে ঘরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম এ শাড়ি দিয়েই গলায় ফাসি দিয়ে আত্মহত্যা করবো। কিন্তু আমার অনাগত সন্তানের কথা ভেবে সেই পথ পরিহার করে চলে গেলাম বাবার বাড়ি।

বাবার বাড়িতে সাত মাস পর আমার কোল জুড়ে এলো ছেলে সন্তান। আমার সন্তান হবার পর আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ আমাকে বা আমার সন্তানকে দেখতে আসেনি। সন্তান হওয়ার পর দুই বছর থাকলাম বাবার বাড়িতে।

একদিন আমার শ্বশুরের ভীষণ অসুস্থতার খবর শুনে দেখার জন্য একাই চলে এলাম শ্বশুরবাড়ি। আমার সন্তানকে দেখে বাড়ির সবাই খুব খুশি। বিশেষ করে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি। খুশি দেখে মনে মনে ভাবলাম এবার হয়তো তাদের আচরণ কিছুটা ভালো হবে। কিন্তু না, কিছুদিন যেতেই শুরু হলো সেই আগের মতো ঝগড়া আর খারাপ আচরণ, এমনকি আমাকে এবং আমার স্বামীকে একবেলা খেতে দিতো।

একদিন দুপুরবেলা ভাত নিংড়ানো মাড় লবণ দিয়ে খাচ্ছিলাম ক্ষিধের জ্বালায়। আমার শাশুড়ি দেখে ফেলেন এবং শুরু করেন প্রচণ্ড ঝগড়া। এক পর্যায়ে ভাতের পাতিল ফেলে দিলেন ড্রেনের ভেতর। আমি কিছু না বলে পরের দিন থেকে আমার স্বামীকে নিয়ে পৃথক হয়ে গেলাম শ্বশুর শাশুড়ির সংসার থেকে।

শুরু হলো আমার নতুন সংসার গড়ার সংগ্রাম। বাবার বাড়ি থেকে আনা সাতশ টাকা দিয়ে মুরগি, হাস, ছাগল পালন করে আজ আমি পাচ ছয় লাখ টাকার মালিক। এখন আমি রঙ-বেঙয়ের শাড়ি পরি। আজ যখন যাযাদির জন্য এই চিঠি লিখছি, আমার দুই চোখ ভরে উঠছে নোনা জলে। জানি না এই নোনা জল আনন্দের, না বেদনার?

আক্কেলপুর, জয়পুরহাট থেকে

আনন্দের ঈদ

– নজরুল

প্যাকেট কার জন্যে?

তোমার জন্য মা।

কি আছে এতে?

শাড়ি।

এটা আবার আনতে গেলি কেন?

তোমার ছেলের চাকরির প্রথম বেতনের টাকায় কেনা। ঈদে তোমার জন্য ছোট্ট উপহার মা।

তুই কি কিছু নিয়েছিস?

নিয়েছি মা।

এই তো মাত্র বছর খানেক আগের ঘটনা। ২০০১ সালের জানুয়ারিতে চাকরিতে যোগদান করি সাভারের বিপিএটিসি-তে। ছোটখাটো সরকারি চাকরি। এর আগে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কলেজে পার্ট টাইম লেকচারার হিসেবে এক বছর ছিলাম। মাস্টার্স করেছি ওই একই ইউনিভার্সিটি থেকে।

যাহোক, মূল প্রসঙ্গে আসি। বিপিএটিসি-তে চাকরির বেতন বাবদ যা পাই তা নিতান্তই সামান্য। নিজের খরচ বাদে বাকিটা মাকে পাঠাই।

এ মা-ই আমার সব কিছু। আমার পৃথিবী যাকে ঘিরে আবর্তিত তিনি হচ্ছেন আমার মা। মাকে কতোটা ভালোবাসি তা একমাত্র মা এবং আমি জানি, অন্য কেউ নয়। এই আমি আজ যে অবস্থানে আছি অর্থাৎ আমার মধ্যে আমিত্বকে বিকশিত করার জন্য মা যে কতোটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা বর্ণনাতীত। কোনো এক সময়ে মধ্যবিত্তের সংসার বাবার রোজগারে যখন আর চলে না তখন মা-ই কায়িক শ্রম দিয়ে আমার লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছেন। তিন ভাই, দুই বোনের মধ্যে আমি ছিলাম সবার ছোট। জানি না এ কারণে, নাকি অন্য কোনো কারণে মা আমাকে একটু বেশি আদর করতেন। খাবার-দাবার থেকে অন্য সব কিছুতেই আমার প্রতি মায়ের বিশেষ টান লক্ষ্য করতাম।

২০০১ সালে চাকরিতে যোগদানের পর মার্চে ঈদুল আজহার আগের দিন বাড়িতে গেলাম। গিয়েই উপরোক্ত ঘটনার অবতারণা। পরের দিন ঈদ। তাই সকাল সকালই বিছানায় গেলাম। বিছানায় মাথা রাখতেই ঘুম। সকালে ফজরের নামাজ পড়ে মাকে বললাম শাড়িটা পরতে।

মা বললেন, রান্না-বান্নার পর গোসল সেরে পরবেন।

গোসল শেষে সেমাই খেয়ে ঈদগা-এর দিকে রওনা হলাম। এসে দেখি মা শাড়িটা পরেছেন। মাকে সালাম করার জন্য নিচু হতেই মা ঝাপটা টানে আমাকে বুকে টেনে নিলেন। হাউমাউ করে কেদে উঠলেন মা। আমিও ঘটনার আকস্মিকতায় কেদে ফেললাম। কতোক্ষণ কেটে গেছে জানি না। অনেকক্ষণ কেদে মা নিজেকে কিছুটা হালকা করলেন। এরপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। ঈদের দিন মা কেন কাদলেন এভাবে তা আমি জানি।

ঈদে আমার দেয়া শাড়ি মাকে পরতে হবে এটা কখনো ভাবেননি। মা আমাকে এখনো সেই ছোট্টটি ভাবেন। অবশ্য অন্য ক্ষোভও ছিল, ছিল উপেক্ষিত হওয়ার প্রতিবাদ। মা তার বড় ছেলের কাছ থেকে যতোটা আশা করেছিলেন তার ন্যূনতম অংশও পাননি। বড় ছেলে অর্থাৎ আমার বড়ভাই মায়ের প্রতি বরাবরই ছিলেন উদাসীন। অন্যপক্ষে আমার মামাবাড়ির অবস্থা সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও মা ওই দিক থেকে কোনো সহযোগিতা কখনো পাননি। মায়ের দুঃখ এটাই।

সত্যি বলতে কি, মাকে উপহার দেয়া এ শাড়িটাই আজ মাকে অন্য রকম করে দিয়েছে। মা অনেক বছর পর মন খুলে কাদলেন। জানিয়ে দিলেন তার না পাওয়ার ক্ষোভ। যে ক্ষোভ চোখের জলে লাভার মতো ছড়িয়ে পড়লো আমার চিবুকে।

আসলে ব্যক্তি ও বস্তুর ওপর উপহারের যথার্থতা এবং আনন্দ অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে যেমনটি ঘটেছে আজ আমার বেলায়। আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ঈদ ছিল এটি। কেননা পবিত্র ঈদে উপহার গ্রহণকারী ব্যক্তিটি হচ্ছেন আমার মা আর বস্তুটি হচ্ছে শাড়ি।

সাভার থেকে

পাগল স্বামী

– তানিয়া হামিদ

বিয়ের পর তিন বছর হতে চললো। ওনার স্বভাব, মাসের বেতন তুলেই আমার জন্য দুই একটি শাড়ি কিনে ঘরে ফেরা। আমার লকার শাড়িতে ভরে যাওয়ার পথে। এমন কতোগুলো শাড়ি আছে যেগুলোর প্যাকেট আজো খোলা হয়নি। এতো শাড়ি থাকা সত্ত্বেও আমার ইচ্ছে মতো শাড়ি পরতে পারি না।

প্রতিদিন সকালে তিনি জানিয়ে দেন, গোসলের আগে কোন শাড়ি পরবো, গোসলের পরে কোন শাড়ি পরবো এবং কোন শাড়ি পরে বেড়ে যাবো।

আমার স্বামীটি যেন আমার চেয়ে আমার শরীরের শাড়িকেই বেশি ভালোবাসে।

তিনটি বছর কেটে গেল। এক মুহূর্তেও তাকে রাগ করে কথা বলতে দেখিনি। আমার স্বামীটি যেন শাড়ি পাগল।

টুটপাড়া, খুলনা থেকে

ব্যবহার

– এসএম আসাদুজ্জামান

শাড়ি পরলে সাবিনাকে খুব মানাতো বলে ও মাঝে মধ্যে শাড়ি পরতো। আমি বলতাম শাড়ি পরলে তোমাকে দারুণ মানায়। এতে সে খুব খুশি হতো এবং কৃতজ্ঞ থাকতো। একদিন আমাকে সে বললো যে, আমি স্বপ্নে দেখলাম, তুমি আমার জন্য সুন্দর একটা শাড়ি এনেছো। সেটা পরে তোমার সঙ্গে অনেক দূরে ঘুরতে গিয়েছিলাম। কথাটা সে সত্য, না মিথ্যা বলেছে সেটা সেই জানে। আমি তো বিপদে পড়ে গেলাম।

কথাটা শুনে আমার খুব লজ্জা লাগলো এবং আমার খুব ইচ্ছে হলো যেভাবেই হোক তাকে একটা শাড়ি উপহার দেবো। টাকা-পয়সা নেই, কি করি। পকেট খরচ বাচিয়ে এবং এক মাস প্রাইভেট বন্ধ দিয়ে শাড়ি একটা কিনলাম ঠিকই কিন্তু সমস্যা হলো দেবো কিভাবে।

কার নাম করে সে নেবে। তাকে জানালাম, সে আর আমি পরামর্শ করলাম, আমার উপহার তাকে দিতে হলে কিভাবে দেয়া যায়। দুজনে বুদ্ধি এটে তার মায়ের কাছে থেকে অনুমতি এনে পাশের গ্রামের একটা মেয়েকে সে ধর্মবোন ডাকলো। তাদের বাড়িতে প্রায়ই সে যেতো। এবং সেও আসতো। খুব

খাতির হয়ে গেল। পরে তার নাম করে আমার দেয়া শাড়ি উপহারটি সে নিল। এবং বিনা বাধায় ব্যবহার করতো।

কুমিল্লা, সেনানিবাস থেকে

চিরনতুন

– ইয়াছমিন সুশ চৌধুরী

আমাদের বিয়েটা ছিল প্রেমের। আমাদের উভয়ের বাবা–মা কেউ রাজি ছিল না এই বিয়েতে। ও সবেমাত্র কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছে। আমি বিএ পড়ছি। তাদের বাসা থেকে বললো, সে যদি নিজের যোগ্যতায় বিয়ে করতে পারে তাহলে যেন করে, তারা কোনো প্রকার সাহায্য করবে না। অবশেষে সে একটি মাত্র শাড়ি দিয়ে আমাকে বিয়ে করলো। আমি গোসল করে যে কি পরবো তাও তাদের বাসার কেউ ভাবেনি। আমার ছোট বোন লুকিয়ে তিনটা পরার শাড়ি দিয়েছিল বলে বেচে গিয়েছিলাম।

বিয়ের পর আমার কাজকর্মে, ব্যবহারে খুশি হয়ে শাশুড়ি শ্বশুরকে বলেছিলেন আমাকে একটি পরার শাড়ি কিনে দিতে। শ্বশুরসাহেব তিনটা ধমক দিয়ে বললেন যে, সে আয় করে (আমার স্বামীকে) তার বৌকে শাড়ি কিনে দেবে, আমি দেবো কেন?

এ কথা শুনে দুঃখে–কষ্টে আমার চোখ ফেটে কান্না এসেছিল। তারা ছিল বেশ সচ্ছল, দিলে দিতে পারতেন। আমার স্বামী দেবে কিভাবে? তার তো সিগারেট খাওয়ার পয়সাই হতো না। বিএ–র রেজাল্ট হলো, চাকরি পেলাম। স্বামীরও আয় উন্নতি হতে লাগলো। আজ একটা কেন? এক সঙ্গে পাচটা শাড়িও কিনতে পারি। পেছনের দিন কি ভোলা যায়? তখন মাঝে মধ্যে এমন হতো, ভাবতাম এই বুঝি আমাদের স্বামী–স্ত্রীর মধুর সম্পর্কটা টাকা–পয়সার অভাবে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু না, আমার স্বামীর ছিল অসীম সাহস আর ধৈর্য। তার উদারতা এবং সততায় আজও আমরা চিরনতুন, চিরসবুজ।

বরিশাল থেকে

মুরুব্বিদের বিচার

– মিনু

১৯৯৭–এর শুরুতে একটা গার্মেন্টস–এ প্লেন মেশিন হেলপার হিসেবে কাজ নিলাম। ওই গার্মেন্টসে কাজ করতে গিয়ে গার্মেন্টেসের ফ্লোর ইনচার্জ ফারুককে ভালো লেগে গেল। তাকে নিয়ে মনে মনে অনেক কিছু ভেবেছি। কিন্তু বলার সাহস পাইনি কোনোদিন। আমি দেখতে খারাপ না, যথেষ্ট সুন্দরী। আমার পেছনে গার্মেন্টসের কতো ছেলে ঘুর ঘুর করে, আমি পাত্তা দিই না।

একদিন ফারুক সাহেব আমাকে বললেন, মিনু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, ছুটির পরে গেটে দাড়াবে।

আমি তো মনে মনে মহাখুশি। রাতে ছুটির পরে ফারুকের জন্য গেটে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর সে গার্মেন্টস থেকে নামলো এবং আমাকে বললো, চলো।

তার পেছনে পেছনে হাটতে লাগলাম। হাটতে হাটতে দুইজনে কথা বলছি।

ফারুক আমাকে বললো, মিনু, যে কথা বলার জন্য তোমার সঙ্গে হাটছি সে কথাটা হলো, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে, আমি তোমাকে চাই।

বললাম, তা হয় না।

এভাবে সে প্রতিদিন আমার সঙ্গে আমার বাড়ি পর্যন্ত আসতো। তারপর তাকে আস্তে আস্তে অনেক ভালোবাসতে শুরু করলাম।

একদিন আমাকে ফারুক বললো, মিনু, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো শুক্রবার দিন ঠিক নয়টায়। তুমি পঞ্চবটি আসবে, তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করবো।

শুক্রবারে আমার এক ভাবীর একটি শাড়ি পরে সেজেগুজে পঞ্চবটি হাজির হলাম। ফারুকের সঙ্গে দেখা হলো।

ফারুক একটি বেবিট্যাকসি দিয়ে আমাকে ঢাকা বোটানিকাল গার্ডেনে নিয়ে গেল। আমাকে বললো, শাড়িতে তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে।

আমার কতো প্রশংসা সে করলো। আমার কোলে মাথা রেখে আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিলো। আমাকে আদর করলো। ঠোটে চুমু খেলো। আমার স্তনে হাত দিয়ে আমাকে আদর করলো। আমি না করতে পারিনি। সেদিন বিকেলেই আমরা দুইজন নারায়ণগঞ্জে চলে আসি।

তার কিছুদিন পর ফারুক আমাকে একটি নীল রঙ-এর শাড়ি উপহার দিল। বললো, মিনু, আগামীকাল একটি নাকফুল ও এই শাড়িটি পরে গার্মেন্টসে আসবে। আমি তোমাকে আমার মন ভরে দেখবো।

এ শাড়িই যে আমার কাল হবে, কলঙ্ক হবে তখন তা বুঝিনি, পরে বুঝতে পেরেছি।

ফারুকের কথামতো পরদিন তার দেয়া সেই শাড়িটি পরে গার্মেন্টেসে গেলাম। আমাকে দেখে ফারুক তো মহাখুশি। কাজের ফাকে ফারুক বললো, রাতে তোমাকে নিয়ে এক বন্ধুর বাসায় যাবো।

বললাম, ঠিক আছে।

রাতে ফারুকের সঙ্গে তার বন্ধুর বাসায় রওনা হলাম। পথে রিকশায় ফারুক আমাকে বললো, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবে আমরা স্বামী-স্ত্রী। তা না হলে বিপদ হবে।

বললাম, ঠিক আছে।

ফারুকের বন্ধুর বাসায় যাওয়ার পর তার বন্ধু সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আমার বন্ধুর স্ত্রী। অনেক মানুষই আমাকে দেখতে এলো। সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বললাম। কাউকে বুঝতেই দিইনি যে, আমরা সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী না।

ফারুকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক রাত হলো। এরই মাঝে বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি নামলো।

ফারুকের বন্ধু এসে বললো, ভাবী, বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। আজকে বাসায় যাওয়ার দরকার নেই। আজকে রাতটা এখানেই কাটিয়ে যান।

আমি রাজি না হলেও ফারুকের পীড়াপীড়িতে থাকতে রাজি হয়ে গেলাম। আমাদেরকে একটি রুমে থাকতে দিল। সে আমার খুব কাছে এলো। আমার ডান হাত তার হাতে নিয়ে নিজের দিকে টানলো আমাকে। সে আমাকে পাজাকোলে করে খাটে নিয়ে শোয়ালো ও আমার ঠোটে চুমু খেলো। তার দুই হাত আমার চিবুক থেকে কণ্ঠদেশ বেয়ে নেমে যায় বুকে। বুকে এসে তার হাতের আঙুল অস্থির হয়। তারপর এক এক করে সে আমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ফেলে। আমাদের ভেতরে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। এক সময় ঝড় থেমে যায়। দুটি দেহ শান্ত হয়ে যায়। এভাবে ওই রাতে আরো দুইবার হলো।

বললাম, এটা কি ঠিক হলো?

সে বললো, আজ আমাদের বাসর রাত।

সেদিন তাকে আমার সব কিছু উজাড় করে দিলাম।

কিছুদিন পর আমাকে সে চাকরি থেকে না করে দিয়ে বললো, আমি নাকি কলগার্ল। খারাপ মেয়ে, পতিতা, যা কি না বিশ ত্রিশ টাকায় এক রাতের জন্য পাওয়া যায়।

দুই চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। একদিন ফারুকের মহল্লায় গিয়ে মুরুব্বিদেরকে সব কথা খুলে বললাম।

মুরুব্বিরা বললো, আগামীকাল তুমি এখানে আসবে, ফারুক যেন না জানে।

পরদিন ফারুকের মহল্লায় গিয়ে এক মুরুব্বির বাসায় থাকলাম। রাতে দশ এগারোটার দিকে আমাকে নিয়ে ফারুকের বাসায় গেল।

ফারুরকে ডাকলো। ফারুক আমাকে দেখে বললো, তুমি এখানে কি চাও?

বললাম, তোমাকে চাই চিরদিনের জন্য।

মুরুব্বিরা আমাকে বললো, তোমার সঙ্গে ফারুকের কি সম্পর্ক?

বললাম, স্বামী-স্ত্রী যা করে তার মতোই সম্পর্ক।

ফারুক বললো, ঠিক আছে, আপনারা কাজি নিয়ে আসুন, আমি তাকে বিয়ে করবো।

রাত বারোটার মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। সেদিনও সেই নীল শাড়িটিই পরে এসেছিলাম।

আজ আমি এক সন্তানের মা। আমার স্বামী আমাকে অনেক আদর করে, ভালোবাসে। কিন্তু সেই নীল শাড়িটি আমাকে পরতে দেয় না।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

ছোয়া

– সায়মা আকতার

বয়স কম বলে ভালোবাসা কি সেটা ঠিক বুঝতাম না। তবে তাকে যে ভালো লাগতো তা বেশ বুঝতে পারতাম। তাই তো যখন তখন বারান্দায় দাড়িয়ে তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

হ্যা, সে ছিল আমার বাবার বন্ধুর ছেলে। বাসাও ছিল পাশাপাশি। সেই সুবাদে প্রায়ই দেখা হতো। কিন্তু কথা হতো খুবই কম। তার কথা বলার ধরন ও তাকানো দেখে বুঝতাম আমাকে সে খুব পছন্দ করে। প্রতিদিন চোখাচোখি আর কদাচিৎ কথা বলার মধ্য দিয়েই আমার সময়গুলো কেটে যাচ্ছিল।

আমার এক জন্মদিনে স্কুল থেকে ফিরে রুমে ঢুকেই টেবিলে দেখি র‌্যাপিং পেপারে মোড়ানো আকর্ষণীয় একটা প্যাকেট, সঙ্গে তাজা লাল গোলাপ। এক নিশ্বাসে প্যাকেট খুলে দেখি সুন্দর একখানা শাড়ি এবং চিরকুট। তাতে লেখা, জন্মদিনে শুধু তোমার জন্য আমার এ ছোট্ট উপহার। আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। জানলাম, কাজের মেয়েকে দিয়ে একটু আগেই পাঠিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিলাম শাড়িটা পরে প্রথমেই তাকে দেখাবো।

সুযোগও এসে গেল একদিন। শুনলাম এ মুহূর্তে সে ছাড়া বাসায় কেউ নেই। তাই শাড়িটা পরে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে সোজা তার বাসায় চলে গেলাম। বেল টিপতেই দরজা খুলে সে যেন চমকে গেল। নিথর হয়ে দাড়িয়ে থাকলো। আমি কথা বলায় সে সংবিৎ ফিরে পেল। আমার হাত ধরে সোজা তার রুমে নিয়ে গেল। সে আমার হাতটায় চুমু খেলো। মুহূর্তেই আমার শরীরে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম কোনো পুরুষের ছোয়া পেলাম। আমার শরীর থরথর করে কাপতে লাগলো। আমি যেন আর দাড়াতে পারছিলাম না।

সে বলতে লাগলো, মানুষ এতো সুন্দর হয়! হে বিধাতা, তুমি মহান। এ কথা বলেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

পরে উভয় পরিবারের সম্মতিতেই আমাদের বিয়ে হয়েছে। আজো যখন সে কোনো নতুন শাড়ি কিনে আনে, শাড়ি পরে তার সামনে দাড়াতেই আমার ডান হাতে চুমু একে দেয়। আর আমি শিহরিত হই প্রথম শাড়ি পরার সেই দিনটির মতোই।

লালমোহন, ভোলা থেকে

অন্তরালে

– টিআই ডাউফ

এক.

মামাতো ভাইয়ের বিয়ের শাদামাটা অনুষ্ঠান। তখন রাত এগারোটা। স্থানীয় কাজি ডেকে বিয়ে পড়ানো হলো। আমাদের গ্রামের রেওয়াজ অনুযায়ী এবার চিনিমুখ করানোর পালা। সবাইকে চিনি খাওয়ানো হলো। কিন্তু সমস্যা হলো নতুন বৌকে নিয়ে। কেউ-ই তাকে চিনি খাওয়াতে পারছে না। আমাদের বরপক্ষের কেয়া, লিলি, জেসী, হারুন, চঞ্চল, মাহী সবাই একে একে ব্যর্থ হলো। ডাক পড়লো আমার। বীরদর্পে এগিয়ে গেলাম নতুন বৌয়ের দিকে। শাড়ির আচল দিয়ে ইয়া বড় ঘোমটা টেনে তিনি বসে আছেন খাটের ওপর।

বারকয়েক ঘোমটা সরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। এদিকে কনেপক্ষের মেয়েরা আমাকে উদ্দেশ্য করে নানান রকম ঠাট্টা-মশকরা শুরু করলো। আমার ইগোতে লাগলো। তাই ঘোমটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে নতুন বৌকে চিনি খাওয়ানোর চেষ্টা করছি, তাও পারছি না। কারণ তিনি মাথা নিচু করে মুখ

বন্ধ করে আছেন। জোরাজুরির এক পর্যায়ে আমার হাতটি মুখ ছাড়িয়ে ছুটে গেল নতুন বৌয়ের পাহাড়ি এলাকায়। সুযোগ বুঝে আমিও তৎক্ষণাৎ হাতের কাজটি সেরে নিলাম। ডান পাহাড়ে একটি চাপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার দিকে চোখ গরম করে তাকালেন। বুঝতে বাকি রইলো না। এ অগ্নি দৃষ্টির পুরোটাই ঘৃণায় ভরপুর। এ ঘৃণা শুধু আমার জন্য। উপস্থিত কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নববধূ ঘোমটা টেনে মাথা নিচু করে ফেললেন।

মাস খানেক পর মামাতো ভাইয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে নতুন ভাবীর সঙ্গে দেখা হলো। চা-নাশতা খাওয়ানোর ফাকে বললেন, বিয়ের রাতে চিনিমুখ করানোর নামে তুমি আমার সঙ্গে যা করেছো তা কোনোদিন ভুলবো না। এবং তোমাকে কখনোই ক্ষমা করবো না। কারণ তুমিই হলে প্রথম পুরুষ যে আমার শরীরে প্রথম হাত দিয়েছে। কোনোদিন কল্পনাও করিনি স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পুরুষ আমার নিষ্পাপ শরীরে হাত দেবে।

বলতে বলতে ভাবীর চোখ ছল ছল করে উঠলো। সেদিন আমার বিয়ের শাড়ির ঘোমটা অনেক বড় ছিল বলেই তুমি এ সুযোগটা নিতে পেরেছো এবং আমাকে এতো বড় একটা কষ্ট হজম করতে হয়েছে। সে রাতের পর থেকে বিয়ের শাড়িটা যতোবার আমার চোখে পড়েছে, অন্তর থেকে তোমাকে ঠিক ততোবারই ঘৃণা জানিয়েছি।

সেদিন চা শেষ করে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলাম। আমি আজ ভাবীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

দুই.

সাতসকালে বড় চাচির ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো। ঘুম থেকে তুলে চাচি আমাকে বললেন, আজ রিক্তা বৌমাকে আনতে যাওয়ার কথা। স্কুলে জরুরি মিটিং আছে তাই সাঈদ যেতে পারবে না। পাঠানোর মতো আর তো কেউ নেই। তাই তোকেই যেতে হবে বাবা। নাশতা খেয়ে সকাল সকাল চলে যা।

সাঈদভাই বড় চাচার একমাত্র ছেলে। স্থানীয় হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বছর খানেক হলো বিয়ে করেছেন। বৌ পেয়েছেন দেখার মতো। দশ গ্রামে এমন আকর্ষণীয় সুন্দরী পাওয়া দুষ্কর। বিয়ের আগে থেকেই রিক্তাভাবীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বিয়ের পর এই এক বছরে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের এবং দুষ্টুমির ভালো একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর রিক্তাভাবীকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে রিকশায় উঠলাম। শাড়ির পর্দা ঘেরা রিকশায় ভাবী আর আমি। হুড তোলা রিকশার চারদিকে মোটা কাপড়ের শাড়ি দিয়ে পেচানো। গ্রামাঞ্চলের নববধূ বা মহিলাদের সাধারণত রিকশায় এভাবেই চলাচল করতে দেখা যায়।

রিকশায় বসেই ভাবীকে উদ্দেশ্য করে বললাম -

শাড়ির ভেতরে শাড়ি

হাত বাড়াইয়া ধরি।

কি ধরবি? ভাবীর প্রশ্ন।

তোমাকে। আমার সহি জবাব।

পারলে ধর, দেখি তোর কতো সাহস! বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাবীর বুকে হাত দিলাম আমার সাহসের প্রমাণ দেয়ার জন্য। মুহূর্তের মধ্যে ভাবী আমার ডান গালে বসালেন এক থাপ্পড়। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকরাম। ভাবী আমাকে কাছে টানার চেষ্টা করলেন।

খুব আদুরে গলায় বললেন, ব্যথা পেয়েছিস? তুই তো বেশ কবিতা লিখতে পারিস। আমাকে লেটেস্ট একটা কবিতা শোনা তো। তবে শর্ত একটা, কবিতার বিষয় হতে হবে শাড়ি। ভাবী অনুরোধ করলেন।

থাপ্পড় পরবর্তী পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য এবং আমার মনটা ভালো করার জন্যই যে ভাবী এ অনুরোধ করলেন তা আমার বুঝতে দেরি হলো না।

আমারও একটি শর্ত আছে, ভবিষ্যতে কখনোই আমাকে তুমি থাপ্পড় দিতে পারবে না। বলেই শুরু করলাম।

যেখানে দেখিবে নারী
উঠাইয়া দেখো শাড়ি,
পাইলে পাইতেও পারো
একখান রসের হাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ডানগালে পড়লো আরেক থাপ্পড়। এতোই ব্যথা পেলাম যে, চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেল। আমার চোখে পানি দেখে ভাবী আমার মাথাটাকে তার বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সরি, বাড়িতে গিয়ে কাউকে কিছু বলিস না। আসলে তোকে এতো জোরে মারতে চাইনি। বলতে বলতে ভাবী আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। তার নরম বুকের উষ্ণতায় আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। আমার ভেতরে অন্য রকম অনুভূতি কাজ করছিল।

রিকশার চারদিকে শাড়ির প্রাচীর। চলছে রিকশা, দুলছে রিকশা, দুলছে ভাবী, দুলছি আমি। হঠাৎ এক ধাক্কায় ভাবী বুক থেকে আমার মাথা সরিয়ে দিলেন। রিকশার শাড়ি ফাক করে দেখি চাচা-চাচি ও অন্যরা দাড়িয়ে আছে। অর্থাৎ রিকশা এখন বাড়ির গেটে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

পরিচিতি

– আ.স.ম আজাদ খান

২৫ আগস্ট ১৯৭২। আমরা তখন ধানমন্ডির সাতাশ নাম্বার সড়কের এক বাসাতে থাকি। বাসায় মেজমামা বেড়াতে আসাতে তাকে আমার শোবার ঘরটা ছেড়ে দিয়ে ছাদে স্টাডি রুমে ঘুমিয়েছিলাম। ভোর রাতের দিকে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় এবং বুকটা ধক করে ওঠে। বেশ কয়েকদিন থেকেই মা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। অশুভ আশংকায় তাই দুরু দুরু বুকে দরজা খুলে দিতেই দেখি মেজমামা দাড়িয়ে আছেন।

আমাকে আদর ভরা গলায় বললেন, আমার সঙ্গে নিচে একটু আয়তো বাবা।

তার এ দরদ মাখানো আহ্বানেই আমার অশুভ আশংকার মাত্রাটা আরো বেড়ে যায়। কাপা পায়ে নিচে গিয়ে দেখি মায়ের বিছানার পাশে ঘিরে আছেন সবাই। দাদা (বড় ভাই) নির্বাক চোখে মায়ের নিষ্প্রাণ মুখের দিকে তাকিয়ে! মাত্র আড়াই বছর আগে বাবাকে হারানোর দুঃস্মৃতি মুছতে না মুছতেই মাকে হারালাম।

জোহরের নামাজের পর জানাযা শেষে তাকে দাফন করা হলো আজিমপুর নতুন কবরস্থানে। দাফন শেষে বাসার দরজায় ঢুকতেই একটু আগে হারানো মায়ের স্মৃতিটুকু আবারও অস্থির করে তুললো। মায়ের ঘরে ঢোকার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। কান্না সামলাতে দৌড়ে ছাদে উঠলাম। চোখ আটকালো কাপড় শুকানোর রশিতে ঝুলতে থাকা সবুজ পাড়ের শাদা শাড়িটাতে। মায়ের শেষ পরিধেয় এই শাড়িটি ধুয়ে শুকাতে দেয়া হয়েছে ছাদে। সদ্য শুকাতে দেয়া শাড়িটির আচলের প্রান্ত থেকে তখনো ফোটা ফোটা পানি ঝরে পড়ছে ছাদের প্লাস্টারে। দৃষ্টি ফেরাতে পারলাম না শাড়িটার দিক থেকে। এই কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত এ শাড়িটা মায়ের পরনে শোভা পাচ্ছিল। ক্রমেই কাছে এসে শাড়িটার এক প্রান্ত হাতে নিয়ে নাকের কাছে নিয়ে মায়ের শরীরের পরিচিত ঘ্রাণটুকু প্রাণভরে অনুভব করলাম। শাড়িটি মুখে চেপে ধরে ফুপিয়ে কেদে উঠলাম।

আজ এতো বছর পরেও মনে হয় তিনি আছেন। একটু পরেই রোদটুকু থিথিয়ে এলে ছাদে আসবেন রোদে শুকাতে দেয়া তার প্রিয় শাড়িটা তুলে দিতে যেটি আমার চোখের সামনে এখনো দুলছে সবুজ পাড়ের সেই শাদা শাড়িটা।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

মেয়েদের ঝাক

– মহসিন সিদ্দিক রনজু

১৯৯৮–র অকাল বন্যায় পাবনা শহরের নিকটবর্তী চরাঞ্চল প্লাবিত হয়। আমি *পাবনা পেশাজীবী সংগঠন* নামে একটি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। উক্ত সংগঠন বন্যায় প্লাবিত জনগণের সাহায্যের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মোতাবেক এক সময়ের বাম ছাত্রনেতা, বর্তমানে বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট শিমুল বিশ্বাসের উদ্যোগে এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১০ লক্ষাধিক টাকার ত্রাণসামগ্রী যোগাড় করা হয়। ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট দিনক্ষণও ঠিক করা হয় এবং বন্যা উপদ্রুত এলাকায় তা জানানো হয়। নির্দিষ্ট দিনে তিনটি বড় নৌকা, স্থানীয় ভাষায় *বজরা* ভাড়া করা হয়। ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য শহরের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বড় ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদরা আসেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিশাল বহর নিয়ে রওনা হই।

ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল ম্যাচ, চিড়া, গুড়, শুকনো খাবার, মুড়ি, ওষুধ, স্যালাইন, চাল, বিস্কিট এবং বিপুল পরিমাণ শাড়ি। শাড়ি বিতরণের জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। একটি হ্যান্ড মাইক নিয়ে আমার সাহায্যকারী হিসেবে টুটুল, জনি, ফজলু, টিপু, লুক্কু, মানিক কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একটি নৌকায় উঠলাম।

সারাদিনের প্রোগ্রামে দুপুরে স্থানীয় কোনো মাতব্বরের বাড়িতে খিচুড়ি খাওয়ার পূর্ব ব্যবস্থা ছিল। পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকা চরঘোষপুর, চরবলরামপুর, ডিগ্রির চর, সদিরাজপুর বাংলাবাজার, কোশাখালি, কুষ্টিয়া জেলার কিছু গ্রাম আমাদের লক্ষ্যস্থল ছিল।

নৌকা ছাড়লো। চারদিকে পানি আর পানি। বাড়িঘর প্রায় সবই ডুবে গেছে। মানুষজন বিকল্প উপায়ে নিজ নিজ বাড়িতেই প্রায় সবাই অবস্থান করছিল। বন্দুক, ভিডিও ক্যামেরা সবই বহরের সঙ্গে ছিল। পনেরো বিশটি বাড়ির লোকজন এক জায়গায় জড় হচ্ছিল এবং ত্রাণসামগ্রী সেখানে নৌকা ভিড়িয়ে বিতরণ করা হচ্ছিল।

সব কিছু ঠিক মতোই হচ্ছিল। কিন্তু শাড়ি বিতরণের প্রক্রিয়া ক্রমেই ব্যাহত হচ্ছিল। কারণ আগে থেকে তাদের জানা ছিল। ওই অঞ্চলের বাসিন্দা ঢাকাইয়া নামে পরিচিত। বিভিন্ন কারণে তারা ত্রাণসামগ্রী নিতে খুব পটু ছিল। শাড়িবাহিত নৌকা ঘাটে না ভিড়তেই মেয়েরা হুমড়ি খেয়ে নৌকার ওপর পড়ছিল। বেশির ভাগ সময় মেয়েরা নৌকাতে উঠে পড়ছিল এবং শাড়ি নেয়ার প্রতিযোগিতায় হুড়োহুড়ি করছিল।

একে তো মেয়েদের শরীর ভেজা ছিল, তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়া শাড়ি, সালোয়ার কামিজ পরে শরীরের বেশির ভাগ অংশ অনাবৃত করে শাড়ি নেয়ার কৌশল অবলম্বন করছিল। ফলে এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। তাতে দুর্ঘটনার আশংকা দেখা দিল। আগেই বলেছি, প্রচুর ত্রাণসামগ্রী ছিল। কিন্তু শাড়ির প্রতি মেয়েদের এতো দুর্বলতা আগে বুঝতে পারিনি।

পাশের নৌকায় দামি ত্রাণ সহজে পেতে পারে সেটা না নিয়ে তারা শাড়ির জন্য হুড়োহুড়ি করছিল। আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম একই মেয়েরা বার বার শাড়ি পাচ্ছে। কারণ একে তো নৌকা বড়, ভেড়ানোর জায়গা নেই। সেই জন্য ভেড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। ফলে পরবর্তী গন্তব্যে যাওয়ার আগেই পটু মেয়েরা সাতরিয়ে আগেই সেখানে উপস্থিত হচ্ছিল। আমি হান্ডমাইকে বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা থাকছিল না। মেয়েদের ঝাক এমন অবস্থা সৃষ্টি করলো যে, কোনো জায়গায় ভিড়লেই নৌকার ওপরে উঠে শাড়ি নিয়ে নিচ্ছিল বা নেয়ার চেষ্টা করছিল যা আমাদের নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। আমাদের দলনেতা শিমুল বিশ্বাসকেও পাচ্ছিলাম না। কারণ তারা দূরে অন্য সামগ্রী বিতরণ করছিলেন। শেষে সিদ্ধান্ত দিলাম নৌকা নিয়ে নিরাপদ এলাকায় চলে যেতে। ফলে বহু শাড়ি বিতরণ না করেই বাজিতপুর ঘাটে সন্ধ্যায় ভিড়লাম। রাতে শাড়িগুলো জমা দিয়ে তা অন্যভাবে বিতরণের পরামর্শ দিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

আটুয়া, পাবনা থেকে

দিনের ভালো কাজ

– ইউসুফ সুলেমান

১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষে অনেক মানুষ মারা গেলেও চট্টগ্রামে এর ছোয়া ছিল সামান্য। বিভিন্ন জেলায় দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকার লোকজন ছুটে আসতো চট্টগ্রামে কিছু সাহায্য সহযোগিতার

আশায়। মানুষের চট্টগ্রাম *স্টেশন,* কোর্ট বিল্ডিং ও ফুটপাথ, ঝুপড়িতে বাস করতো। অফিসের কাজ উপলক্ষে আমাকে মাসে কয়েকদিন কোর্টে যেতে হতো। একদিন বার লাইব্রেরির দক্ষিণ থেকে লক্ষ্য করলাম একজন বয়স্ক অ্যাডভোকেট গায়ে চট জড়ানো লম্বা চুলের এক ভিখারিনীকে যেন তাড়া করছিল। তাড়া খেয়ে ভিখারিনীটি পালাচ্ছিল। ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিলাম না। দুই একদিন পর দুপুরে কোর্ট বিল্ডিংয়ের পার্কে দাড়িয়ে আনমনা কর্ণফুলি নদী, সবুজ পাহাড়-পর্বতের দৃশ্য দেখছিলাম। পেছনে ঘাড় ফেরাতেই আতকে উঠলাম, একই পোশাকে সে ভিখারিনীটি দাড়িয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছিল। একটি টাকা দিলাম। তাকে দেখে আন্দাজ করলাম সে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। অবস্থার প্রেক্ষিতে বোধহয় এ পোশাকে সাহায্যের জন্য যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তার বাড়ি নর্থ বেঙ্গল। কাপড়ের সুটকেসটি ট্রেনে চুরি হয়ে গেছে। বস্তিতে এক আত্মীয়ের কাছে থাকে। জিজ্ঞাসা করলাম তার জন্য যদি শাড়ি কাপড় আনা হয় পরবে কি না। সম্মতি জানিয়ে মাথা নিচু করে স্থানটি ত্যাগ করে।

রিলিফে দান করবো বলে গিন্নির কাছ থেকে পাড় ছেড়া প্রায় একটি নতুন শাড়ি চেয়ে ছোট প্যাকেটে আমার ভেসপা স্কুটারের টুলস বক্সে রেখে দিলাম তাকে দেয়ার জন্য। এক সপ্তাহ পর কোর্ট বিল্ডিং পার্কে আবার তাকে দেখলে টুলস বক্স থেকে প্যাকেটটি এনে তার হাতে দিলাম। প্যাকেটটি আমার সামনে খুলে *বাহ! কি সুন্দর* বলে খুশিতে চলে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এ ভেবে, এ দুঃসময়ে দিনের ভালো কাজটি করলাম। হুমায়ূন আহমদের এক নাটকে জাহিদ হাসান দিনের ভালো কাজ সংলাপটি প্রায়ই উচ্চারণ করতেন।

আরেকদিন কোর্ট বিল্ডিংয়ের উত্তরের সড়কটি দিয়ে নামছিলাম। দেখলাম কদম গাছটির নিচে এক জটলা। কাকে ঘিরে যেন বকাবকি করছিল। কৌতূহলবশত উকি মেরে দেখে বোকা বনে গেলাম। অর্ধনগ্ন পোশাকে গাছ তলায় বসে আছে কথিত সে ভিখারিনী মেয়েটি। জটলার এক পাশ থেকে চেচিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম আমার দেয়া শাড়িটি সম্বন্ধে।

বেইচ্চা ফেলাইছি, পেটে ভাত, মনে শান্তি না থাকলে শাড়ি পইরা কি লাভ অইবো? তার সোজা উত্তর।

কয়েকজন লোক যখন রাগে তার গায়ে হাত তুলতে উদ্যত হচ্ছিল আবার তখন সে বলে, *কেউ যদি গায়ে হাত তোলে ন্যাংটা হইয়া রাস্তার মাঝে হুইয়া থাকুম।* জটলা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলাবলি করছিল মেয়ে লোকটি এ বিশেষ বেশে বিভিন্ন ফিকির ফন্দিতে লোকজন থেকে কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা আদায় করে। তার এ প্রতারণায় দুঃখ কিছুটা পেয়েছিলাম বটে তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনাও করেছিলাম যেন আগামীতে দেশ যেন যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত থাকে।

সরাইপাড়া, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম থেকে

যন্ত্রণা

– নিশি

অল্প বয়সে বিয়ে হয় আমার। বাবা উপযুক্ত পাত্র পেলেন। ছেলে সরকারি কর্মকর্তা। বিয়ের সময় আমার স্বামী মাত্র একটি শাড়ি দিয়ে বিয়ে করে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য নয়, বিয়ের সময় মেয়েদের কি দিতে হয় সে নাকি তা জানতো না এবং শপিং করার অভিজ্ঞতাও তার ছিল না। তবে বিয়ের পর বৌয়ের সঙ্গে কি করতে হয় এসবই সে জানতো, পারতো এবং অভিজ্ঞতাও তার ছিল।

আমার বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় ষোল বছর। এর মধ্যে বত্রিশটি ঈদ, পনেরোটি বিয়েবার্ষিকী চলে গেল। আমার স্বামী নিজ থেকে কখনো আমাকে বলেনি, চলো, এবার তোমার জন্য একটা শাড়ি কিনবো।

আমি যে শাড়ি পরি না তা নয়। সংসার খরচের পয়সা বাচিয়ে আমার প্রয়োজনীয় শাড়ি বা আমার প্রয়োজন মেটাই।

আমার স্বামী নাকি আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। তার ভালোবাসা নাকি সীমাহীন। নারীদের অধিকার সম্পর্কে সে সব সময় খুব সচেতন। আমাকে সব সময় সে সান্ত্বনার বাণী শোনায়, ত্যাগের মধ্যেই নাকি প্রকৃত সুখ। মেয়েদের নাকি সংসারে শুধু ত্যাগ করতে হয়।

কিন্তু বিনিময়ে আমার মতো বৌদের ষোল বছরে ষোলটি শাড়ি তো দূরের কথা, একটি শাড়িও কি পাওয়ার আশা করতে পারবো না? বছরের বিশেষ দিনে একটি শাড়িও যে বৌকে দিতে হয় তা কি সে বোঝে না? এর নামই কি স্বামীর ভালোবাসা? নাকি যন্ত্রণা?

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ভোলা থেকে

মাটি

– সীমা টসকানো

আমি বিরিশিরি গ্রামের একজন মেয়ে। আর চাকরি করতাম ওয়ার্ল্ড ভিশন অফ বাংলাদেশের একটা ছোট প্রজেক্টে। আমার বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ছিল অফিসটি। খুবই প্রিয় ছিল আমার সেই অফিস, এলাকা এবং এলাকার লোকজন। প্রজেক্টের ছেলেমেয়েরাও আমাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতো, ভালোবাসতো এবং বড়রা করতেন স্নেহ। এভাবে ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আমি সেই এলাকার অফিসে কাজ করি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

সেই অফিসে কাজ করতে করতেই ঘটলো সেই ঘটনাটি। ১৯৯০-এর জানুয়ারিতে সেই প্রজেক্টে এলেন একজন নতুন স্টাফ। ভদ্রলোক মধ্য বয়সী বা তার উপরে। নতুন স্টাফের সঙ্গে সুন্দরভাবে পরিচয় হলো এবং একত্রে সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছিলাম। এভাবে হঠাৎ দুই মাস যেতে না যেতেই ভদ্রলোক আমাকে এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়ে বসেন যে, তিনি ওনার বড় ছেলের জন্য আমাকে খুব পছন্দ করেছেন। আমি তো শুনে খুব অবাক হয়ে গেলাম এবং এসব ব্যাপারে আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ করতে বললাম।

এরপর তিনি আমাদের বাড়ি এলেন এবং পরিচয় পর্বের পর ওনার প্রস্তাবও রাখলেন।
তারপর আস্তে আস্তে সুন্দর মতো সব কিছু পাকাপাকি হয়ে গেল। তখন থেকেই ওনার সঙ্গে আমার এবং আমাদের পরিবারের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন এবং বাবা-মায়ের সঙ্গে মজা, ঠাট্টা করতেন, খাওয়া-দাওয়াও করতেন। বিয়ের আগে থেকেই আমার হবু স্বামী আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখতেন এবং আমিও লিখতাম। চিঠি আমার অফিসের ঠিকানায় আসতো। আমার হবু শ্বশুর মজা করতেন এবং বলতেন, আরে আমি একি সর্বনাশ করলাম, আমিই সব কিছু ঠিক করলাম, এখন দেখি আমার ছেলে শুধু তোমাকেই চিঠি দেয়।
এভাবেই চলছিল আমাদের মধুর দিনগুলো। আমার শ্বশুরই আমাকে অফিসে নিয়ে যেতেন এবং বাসায় পৌছে দিতেন। তাই দেখে এলাকার লোকজন খুব মজা পেতো, মজা করতোও। এবং সবাই খুব খুশি হয়েছিল এই ব্যাপারে।
আমার ঊর্ধতন কর্মকর্তারাও আমাকে খুব ভালো জানতেন। আমার জন্য চিন্তা করলেন এবং ওনারাই আমাকে চট্টগ্রাম বদলি হবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ আমার হবু স্বামী তখন চট্টগ্রামেই ছিলেন। আমার বসরা এ কথাই বলেছিল, বিয়ের পর দুজন দুই দিকে থাকলে ভালো হবে না। এভাবে বিয়ের তিন মাস আগেই চট্টগ্রাম এসে পড়লাম। কারণ অফিসের সুবিধার্থে আমাকে আগেই চলে আসতে হয়েছিল। এতে আমার হবু শ্বশুর খুব মন খারাপ করলেন আমার জন্য। হয়তো তিনি আমাকে খুব বেশি স্নেহ করে ফেলেছিলেন।
১৯৯১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আমাদের বিয়ের তারিখ পড়েছিল তাই আমাকে কয়েকদিন আগেই বাড়ি আসতে হয়েছিল। দুদিন পরই আমার বিয়ে। শ্বশুর এলেন, আমি দেখা করলাম। এরপর তিনি আমার মায়ের হাতে একটা ব্লাউজ পিস দিয়ে বললেন শিগগিরই অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নিতে। ব্লাউজ পিসটা দেখেই আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কারণ ব্লাউজ পিসটা দেখেই বুঝতে পারলাম বিয়ের শাড়িটা কেমন হবে।
মাকে ডেকে বললাম, শাড়িটা একদম ভালো হবে না। আমি এই শাড়ি বিয়েতে পরবো না। কারণ এই শাড়ির চল অনেক বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। শাড়িটাও ছিল একেবারে নিচু কোয়ালিটির এবং রঙটা ছিল আরো বাজে। তাছাড়া আমার চয়েসটা ছিল এমন, আমি যা পরতাম হোক তা কমদামি, কিন্তু সবাই তা পছন্দ করতো।
আমার মা গিয়ে আমার শ্বশুরকে বললেন, বিয়াই, আমার মেয়ে তো এই শাড়িটা পছন্দ করেনি। শাড়িটা কি বদলানা যাবে না? যদি বলেন তো আমরাই আর একটা ওর পছন্দ মতো কিনে দিই?
এই কথা শুনে আমার শ্বশুর তেমন কোনো কিছুই বললেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি চলে গেলেন। আমার মনটা আবার খুশিতে ভরে গেল।
এরপর হঠাৎ রাত দশটার দিকে একজন মুরুব্বি গোছের লোক এলেন আমার শ্বশুরের পক্ষ থেকে। তিনি এসে আমার বাবা মাকে অনেক আজে-বাজে কথা শোনালেন এবং বললেন, এ শাড়ি পরেই বিয়ে হতে হবে, না হলে বিয়ে এখানেই ভেঙে যাবে। এই ব্যবহারে আমার বাবা মা একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন।

আমি সব কিছুই শুনতে পেয়েছিলাম। বাবা–মাকে ঠাণ্ডা মাথায় ডেকে বললাম, এই সামান্য শাড়ি নিয়ে আর পরিবেশ নষ্ট করে লাভ নেই। এ শাড়ি পরেই আমার বিয়ে হবে।

আমার বাবা মা রাতে আবার আমার শ্বশুরের কাছে গেলেন এবং বললেন, ঠিক আছে বেয়াই, ওই শাড়িতেই বিয়ে হবে।

হঠাৎ এমন ব্যবহারে আমার মনটা একেবারে ভেঙে গেল। কারণ আমি জানতাম আমার শ্বশুর অত্যন্ত খোলা মনের মানুষ। তাই এই আবদারটুকু করেছিলাম। ফলে সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। পরদিন আমার গায়ে হলুদ হলো। কিন্তু কোনো আনন্দই রইলো না মনে। এরপর সমস্ত বিয়ে বাড়িই ছিল কেমন থমথমে।

সেই শাড়ি পরেই আমার বিয়ে হলো। একদিন পরার পরই শাড়িটার যা অবস্থা হলো তা কিভাবে ভাষায় প্রকাশ করবো। এরপর থেকে আমার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যে একটা তিক্ত সম্পর্ক হলো তা আজো মেটেনি। আমার বিয়ে হয়েছে বারো বছর চলছে। আমার স্বামীর সঙ্গে সুখেই সংসার করছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার শ্বশুর আমাকে ওনার বাড়িতে তোলেননি। তা কোনোদিন হবে কি না তাও জানি না। এখনো আলমারি খুললে শাড়িটা চোখে পড়ে যায়। সেই বিশ্রী ঘটনাটা মনে পড়ে যায় যা আমার বিয়ের আনন্দ এবং জীবনের অনেকটা অধ্যায় মাটি করে দিয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে

বেতন

আমার চাকরির বয়স তিন বছর দেড় মাস। সরকারি চাকরি। বেতন বর্তমান বাজারে চলার মতো মোটেই উপযুক্ত না। ঘুসের সোর্স থাকলে জানি না ঘুস খেতাম কি না। তবে আমার সেকশনে এক পয়সাও ঘুসের বালাই নেই।

ঢাকা কলেজের সামনে থেকে কেনা একশ টাকা দামের দুটি শার্ট এবং বাংলাদেশি কাপড়ের দুটি প্যান্ট সপ্তাহের ছয় দিন ভাগাভাগি করে পরি। জুতোর মাইনর অপারেশন প্রায়ই করাতে হয়। সোল পাল্টানো হয়েছে বার দুয়েক।

বিসিএস ক্যাডারের একজন বসের আন্ডারে আমরা মাত্র তিনজন স্টাফ। দুজন পুরুষ, একজন মহিলা। মহিলাটি আমার চেয়ে তিনশ পচাত্তর টাকা বেশি বেতন পান।

তিনি তেমন আকর্ষণীয় নন অন্তত আমার চোখে। তার দৈহিক গঠন ও মুখাবয়ব আমাকে কখনো আকর্ষণ করে না। তবে আকর্ষণ করে তার শাড়ি পরার স্টাইল। অদ্ভুত সুন্দর ভঙ্গিতে, ততোধিক অদ্ভুত সুন্দর শাড়ি পরেন তিনি।

তার দিকে নয়, তার শাড়ি পরার স্টাইলের দিকে এবং আকর্ষণীয় শাড়ির দিকে মুগ্ধ চোখে প্রায়ই তাকাই। অফিশিয়াল কথাবার্তার বাইরে পারিবারিক কোনো আলোচনাই ওনার সঙ্গে আমার হয়ে ওঠে না। পারিবারিক কথাবার্তা যেহেতু তিনি বলতে চান না তাই আমিও সে চেষ্টা করিনি।

তার যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করলো তা হলো, তিন বছরের মধ্যে তাকে কখনো একটি শাড়ি দ্বিতীয়বার পরতে দেখিনি। প্রথম থেকেই এয়ারহোস্টেসদের মতো তার শাড়ি পরার স্টাইলের প্রেমে পড়ে গিয়েছি বলে ব্যাপারটি আমার চোখ এড়ায়নি।

একদিন লাঞ্চের সময় সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুখ কাচুমাচু করে বলেই ফেললাম, ম্যাডাম, আপনি একটি শাড়ি কি কখনোই দ্বিতীয়বার পরেন না?

না।

কেন?

ম্যাডাম কিছু মাত্র দ্বিধা না করে হাসি হাসি মুখ করে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, আমার হাজব্যান্ড সওজ–এর একজন প্রকৌশলী।

এখন আমি আরেকটি প্রশ্নের উত্তর খুজছি :

সওজের একজন প্রকৌশলী কতো বেতন পান?

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঢাকা থেকে

বোরখাওয়ালী

– তৌফিক

১৯৯৪ সালের কোনো এক বিকেলে মোসলেমস্যারের অংক কোচিংয়ে মণির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ও তখন ছিল খুবই লাজুক, বোরখা পরে আসতো। স্বাভাবিক কারণে ওর দুটো চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যেতো না। নিটোল কালো নেকাবের বাইরে উজ্জ্বল ফর্শা পটলি চেরা চোখ সেদিন কি যে এক আকর্ষণ করে ফেললো তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মনে মনে কতো কিছু সেদিন ওকে নিয়ে ভাবলাম, কল্পনার ফানুস উড়ালাম! সিদ্ধান্ত নিলাম ওর সঙ্গে কথা বলবো। কিন্তু দুদিন পর স্যারের কোচিংয়েও আসা বন্ধ করে দিল।

ওদের সঙ্গে অর্থাৎ দুটো মেয়ের সঙ্গে ও এখানে আসতো জিজ্ঞাসা করলাম ওর না আসার কারণ। কোনো সদুত্তর পেলাম না। অবশ্য ওর বাসা আমাদের পাশের পাড়ায়।

একদিন রাস্তায় আমার বন্ধু বাবুর সঙ্গে দেখা। ও আমার সব কথা জানতে। জানতে পারলাম মাধবস্যারের ব্যাচে রসায়ন পড়তে যাচ্ছে মণি। ঠিক করলাম পরের দিন সকালে ও যে সময়ে পড়তে যায় সে সময়ে ওর সঙ্গে কথা বলবো।

পরের দিন সকালে দেখি আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ভোরে এক পশলা বৃষ্টি অবশ্য হয়েছে। কিছুটা দ্বিধা বোধ করলাম ও আসবে কি না। মনে ভাবলাম, যে করে হোক আজ ওর সঙ্গে দেখা করেই ছাড়বো যতো বৃষ্টিই আসুক।

যদি ও আসে। সাইকেলটা নিয়ে সময় মতো স্যারের কোচিংয়ের রাস্তায় চলে এলাম। পথে বন্ধু টুটুলের সঙ্গে দেখা। জানতে পারলাম মণি এসেছে। নিজেকে বেশ পুলকিত বোধ করলাম। বুকটাও বেশ ধড়ফড় করছে। কিন্তু একটা উত্তেজনা মেরুদণ্ড ভেদ করে চলে গেল।

সকাল আটটা বাজে। কোচিংয়ের পেছনের রাস্তায় অপেক্ষায়। টান টান উত্তেজনা মনের ভেতর, আজ কথা বলবোই। সবাই এক এক করে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু ওর কোনো খোজ নেই। সময় গড়িয়ে যায়, এক সময় দেখি ও বেরিয়ে আসছে।

কাছে আসতেই বীরের মতো বললাম, মণি, কেমন আছো?

জি, ভালো। থতমত খেয়ে জবাব দিল।

জানতে চাইলাম, চলে আসার কারণ।

ও কিছুই বললো না।

বললাম, চলো, সামনে এগোই।

কোথায়? ওর প্রশ্ন।

চলো না, একটু কথা বলবো তোমার সঙ্গে।

এর মধ্যে দেখি আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে গেছে, এক্ষুণি বৃষ্টি নামবে। ছুটে গেলাম পাশে এক ফাকা বাড়িতে। ও যেন কেমন কাপছে। বৃষ্টি শুরু হলো। তুমুল বৃষ্টি। শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। ও কোনো কথা বলছে না। আশপাশে কেউ নেই।

বললাম, মণি, আমাকে কেমন লাগে?

ভালো। সংক্ষিপ্ত জবাব।

শুধু কি ভালো?

চুপ, কোনো জবাব নেই।

একটান দিয়ে অনেকটা জোর করে মুখের নেকাবটা খুলে চুমু খেয়ে বললাম, মণি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ও হতবাক হয়ে বৃষ্টির মধ্যে পালিয়ে গেল।

বললাম, যেও না। কে শোনে কার কথা, নিজেকে অপরাধী মনে করলাম। ভাবলাম এ আমি কি করলাম!

এরই মধ্যে আমার এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। হাতে অফুরন্ত সময়।

একদিন বিকেলে বন্ধু কাজল বললো, তোর একটা চিঠি। ভাবলাম কে লিখলো! খামের উপরে দেখি আমার নাম লেখা। নিচে লেখা, *শুধু তোমাকে।*

খুললাম। পড়ে দেখি লেখা আছে : *বয়রা কলেজে সকাল এগারোটায় দেখা করবে, ইতি ‘ম’*

মনটা খুব উত্তেজনায় ভরে গেল। সারা রাত ঘুম হলো না।

সকালে কলেজ গেটে গিয়ে দেখি ও দাড়িয়ে আছে। বললাম, ম্যাডামের হঠাৎ তলব, কোনো অর্ডার আছে নাকি?

চলো, ও বললো।

একটা রিকশা নিয়ে ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে সে চুমু খেয়ে বসলো।

বললো, শোধ করে দিলাম।

এভাবে আমাদের দিন যাচ্ছিল। কখনো রিকশায়, কখনো বা গিলাতলা পার্কে। কিন্তু ও কখনো বোরখা খুলতো না। আমার ইচ্ছা ছিল বোরখাহীন মণিকে দেখা।
কথা প্রসঙ্গে বললাম, তুমি কি শাড়ি পরতে পারো? বাঙালি ললনাদের শ্রেষ্ঠ পোশাক শাড়ি।
এতো শখ ভালো না। বিয়ে হোক তখন মনের মতো করে আমাকে দেখো। ও বললো।
আমাকে অনেকটা অবাক করে দিয়ে একদিন সম্ভবত রবিবার গিলাতলা ক্যান্টনমেন্ট পার্কে যখন ওকে নিয়ে গেলাম, ও বললো পেছনে ফিরে বসো।
বললাম, কেন?
আহা, বসো না!
বসলাম।
এবার দেখো।
কি বলবো, ও যে এতো সুন্দর। গোলাপি শাড়ি, সেই সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ, মাথার খোপায় ফুলের মালা। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে আজ।
বললাম, বোরখা পরে এগুলো এতোদিন আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে?
ও বললো, নতুন করে আজ আমাকে দেখবে বলে, তোমাকে ধাধায় রেখেছিলাম এতোদিন।
মনে মনে বললাম, ধন্য হে শাড়ি।

খুলনা থেকে

শিহরণ

– হাসান

কোনো এক কম্পানিতে চট্টগ্রামে চাকরি করি। ছুটি পেলেই নিজ বাড়ি রাজশাহীর বিনোদপুর বাজার চলে আসি। ডিগ্রি পাস করে চাকরিতে জয়েন করি। আমার বন্ধুরা তখনো রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স পড়ে। ছুটিতে এলেই বিকেলের নিয়মিত চা আড্ডা তাপসী রাবেয়া ও রোকেয়ার সামনেই সারতাম। বন্ধুদের ক্লাসমেট অনেক বান্ধবীদের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল আখি নামে এক বান্ধবী। আমার নিয়মিত উপস্থিতি ও আড্ডায় আখি দুর্বল হয়ে পড়ে। ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরে আসি। কিছুদিন পর আখির একটি চিঠি পাই, সঙ্গে শাড়ি পরা আখির চমৎকার একটি ছবি।
চিঠির প্রতিউত্তরে লিখি *ছবিতে শাড়ি পরা আখিকে এতো সুন্দর দেখাচ্ছে, বাস্তবে শাড়ি পরা আখিকে না জানি কতো সুন্দর দেখাবে!*
পরবর্তী কালে আমি ছুটিতে বাড়ি এলে নিয়মমাফিক তাপসী রাবেয়া হলে হাজিরা দিতে যাই। আখির সঙ্গে দেখা হতেই বলে, হাসান, আগামীকাল তোমার অনারে শাড়ি পরবো এবং পদ্মায় নৌকা চড়ে ঘুরবো। তুমি বিকাল চারটায় হলের গেটে এসো।

আমি যথারীতি পাঞ্জাবি–পাজামা পরে হাজির। কল দিতেই আখি বেরিয়ে আসে। রিকশাযোগে শহরের টি–বাধে এসে নামি। একটি ছোট্ট নৌকা রিজার্ভ করে পড়ন্ত বিকেলে সূর্যের আলোর প্রতিচ্ছবি নিয়ে পদ্মার পানিতে ভাসতে থাকি।

আখি কিছুক্ষণ পর বলে, হাসান, শাড়িতে আমায় কেমন দেখাচ্ছে একবারও যে কিছু বললে না?

আমি আসলে শাড়ি পরা মেয়ে নিয়ে কোনো সময় ঘুরিনি। তার ওপর আমার পাঞ্জাবি–পাজামা আমাদের সম্পর্কের আরো উন্নতি ঘটিয়েছি যা লোকজনের চাহনি দেখে অনুমান করা যায়। তাই এতোক্ষণ লজ্জায় কিছু বলিনি।

এবার নৌকাতে একা পেয়ে মনের সমস্ত আবেগ উথলে উঠলো। বললাম, শাড়িতে তোমার শরীরের সৌন্দর্য ঢেকে গেছে। তাই সুন্দর দেখাচ্ছে না।

আখি বলে, সে কি!

সাহস করে বললাম, তোমার নাভি তো একদম দেখা যাচ্ছে না। শাড়িতে যদি নাভি দেখা না যায় তাহলে শাড়ি পরার সার্থকতা কোথায়?

আখি বললো, আচ্ছা হাসান, কতোখানি নিচে পরতে হবে ঠিক করে দাও না, বলে নৌকার ওপর দাড়িয়ে যায়।

তাৎক্ষণাৎ শাড়ি কোমর পর্যন্ত নিচের দিকে কিছুটা নামিয়ে দিলাম। এতে তার নাভিটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠলো। আখির চওড়া গভীর নাভি দেখে শিহরিত হলাম। গভীর আবেশে পৃথিবীর সেরা সৌন্দর্য আখির নাভিতে হাত রাখলাম। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আখিও আমার ঠোটে ঠোট রাখে। কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। পাশ দিয়ে স্পিড বোট চলে যাওয়ার আওয়াজে সংবিৎ ফিরে পাই।

সেদিনের শাড়ি পরা আখির ছবির প্রশংসা করা এবং আমার অনারে শাড়ি পরার জন্যই আখির এ রকম চুমু উপহার পেয়েছিলাম।

চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম থেকে

মজা

– এ. রহমান

অনার্সে ভর্তি হবার পর থেকে রীতিমতো ক্লাস শুরু করেছিলাম। কিন্তু ক্লাসের পড়ার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম। আমাদের ডিপার্টমেন্টের মাস্টার্সের মেধাবী ছাত্রী শাম্মীআপার নাম ক্লাসমেটদের থেকে অনেক শুনেছি। কিন্তু তাকে দেখার সৌভাগ্য আজো আমার হয়ে ওঠেনি। শুনেছি শাম্মীআপাই একমাত্র মেয়ে যিনি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। এ যাবৎ কোনো মেয়ে এ ফলাফল করতে পারেনি। তাছাড়া মাস্টার্সেও নাকি তেমন ফলাফলই করবেন।

ক্লাস শেষ করে স্যার যখন বের হচ্ছেন ঠিক তখনই একটি মেয়ে স্যারকে সালাম দিয়ে বললেন, স্যার, কেমন আছেন?

স্যার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, ভালোই আছি। শাম্মী, তোমার পৃপারেশন কেমন, সামনেই তো পরীক্ষা। কি ফার্স্ট হতে পারবে তো?

স্যার শাম্মী বলতেই আমার বোঝার বাকি রইলো না যে তিনিই আমাদের সেই মেধাবী ছাত্রী শাম্মীআপা। শাম্মীআপার সঙ্গে স্যার কথা বলা শেষ করে যখন চলে গেলেন সেই মুহূর্তে বেকুবের মতো শাম্মীআপার কাছে গিয়ে বলি, আপা, আমি এ চ্যাপটার কিছুই বুঝছি না, প্লিজ, আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন কি? স্যার আজো এটা সম্পর্কে লেকচার দিয়েছে।

আপা বললেন, আপনি তো দেখি আজব এক ছেলে। মানুষ তো আগে পরিচিত হয়, তারপর অন্য বিষয়।

সরি আপা। আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি শ্যামল, আমি এই ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। আপা, আমাকে তুমি করে বলবেন।

আপা বললেন, ঠিক আছে। তবে আমাকে যে লাইব্রেরিতে যেতে হবে কাজ আছে। তুমি এক কাজ করো, আমার ঠিকানা এবং ফোন নাম্বারটা লিখে নাও। বিকেলে সময় পেলে বাসায় এসো। বিকেলে মোটামুটি ফৃ থাকি। আমাকে ফোন করে আসবে।

আপার এ কথাতে আমি মহাখুশি। আমার সমস্যার সমাধান হবে। আপার কথা মতো বিকেলে আপাকে ফোন করে আপার বাসায় চলে যাই। আপা কি সুন্দর করেই না আমাকে সেই না বোঝা চ্যাপটারটা বুঝিয়ে দিলেন। এবং বললেন, যখনই সমস্যায় পড়বে সেই সময় চলে আসবে। এই সময় আমি গান শুনে, নভেল পড়ে, আড্ডা দিয়ে ব্যয় করি। তুমি মাঝে মধ্যে এলে না হয় তোমাকে একটু সময় দিলাম।

আপার এ অনুমতি পেয়ে প্রায় বিকেলে আপার বাসায় চলে যেতাম। আপা এবং আমার মাঝে ভালোই সম্পর্ক গড়ে উঠলো। আমাকে আপা খুব আদর-যত্ন করতে শুরু করলেন। যেদিনই আপার বাসায় যাই না কেন, ফোন করে যাই। আপা আজ আসবো কি? কোনোদিন এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু একদিন ফোন করা ছাড়া আপার বাসায় চলে যাই।

আপা বললেন, কি শ্যামল, আজ যে দেখছি ব্যতিক্রম হলো। ফোন না করে চলে এলে। ঠিক আছে বসো, এসে যেহেতু পড়েছো, ভালোই হয়েছে। আজ সকাল থেকে সারাটা দিন বাসায় একা। সবাই ভোরে গ্রামের বাড়িতে গেছে। বিকেলেই ফিরবে। জার্নি করতে পারি না বলে আমাকে রেখে গেল। আমি আজ তোমাকে কিছুই বোঝাতে পারবো না। আমি আজ শাড়ি পরবো নিজে। সেই শাড়ি পরে ছাদে গিয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করবো। তুমি বসো, আমি শাড়ি পরে আসি।

শাম্মীআপা এ কি বলছেন, এতো বড় মেয়ে কি না শাড়ি পরতে পারে না। আপা ভেতর থেকে শাড়ি পরে এসে বলে, শ্যামল বলতো শাড়ি পরা কেমন হয়েছে।

মনে মনে বললাম, হায় খোদা, এমন শাড়ি পরা জীবনে দেখিনি। তারপরও আপাকে খুশি করার জন্য বললাম, বেশ হয়েছে।

আপা বললেন, থ্যাংক ইউ শ্যামল।

তবে শ্যামল, শাড়ি পরা খুব কঠিন। কিন্তু খুলে ফেলা একদম সহজ। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আপা পরনের শাড়িটা খুলে ফেললো। আপার পরনে পেটিকোট আর ব্লাউজ। আপার এ অবস্থা দেখে মাথা নিচু করে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শ্যামল, বলো তো আমাকে শাড়ি পরা অবস্থায় বেশি ভালো লাগে? না এ অবস্থায় বেশি ভালো লাগে?

কিছুই না বলে চুপ করে রইলাম।

আপা তখন আমার কাছে এসে ব্লাউজ, ব্রা খুলে বললো, এবার বলো, আমার চেহারাটা বেশি সুন্দর, না আমার বুকটা বেশি সুন্দর। বলেই আমার হাত দুটিকে তার বুকের দুটি স্তনে বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, শ্যামল, জোরে ধরো, খুব জোরে দেখবে খুব মজা পাবে।

আপা আমাকে জড়িয়ে ধরে ঠোটে, মুখে চুমু খেয়ে বলছেন, কি, মজা পাচ্ছো তো?

আমি তখন লজ্জায় লাল। তারপরও কেন যেন বলে ফেললাম, জি আপা, খুব মজা পাচ্ছি।

আপা বললেন, এই যে তোমাকে আমি মজা দিচ্ছি, এর বিনিময়ে কি তুমি আমাকে কিছু দেবে না?

জি আপা, কেন নয়, অবশ্যই দেবো।

কি দেবে বলে ফেলো।

বললাম, একটি শাড়ি দেবো।

আপা বললেন, এতো কিছু থাকতে শাড়ি দেবে কেন?

বললাম, আমি আজ আপনার শাড়ি খোলা দেখেছি। যেদিন আমি শাড়ি নিয়ে আসবো সেদিন আপনার শাড়ি পরা দেখবো। আজ যেমনভাবে শাড়ি খুলে ফেললেন তেমনভাবে শাড়ি পরা দেখবো।

আমাকে শেষ চুমু খেয়ে আপা বললেন ভারী দুষ্টু হয়েছিস দেখি, এবার হাত দুটিকে আমার বুক থেকে সরিয়ে বাসায় যা। অনেক তো মজা পেলি।

কুমিল্লা থেকে

ভাজে ভাজে

– আলম

আমি তখন খুব ছোট। স্কুলে ভর্তি হয়েছি সবে। আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। বাবা ছিলেন পরিবারের বড় ছেলে। তাই দায়িত্বও ছিল বেশি। আমার দাদার ভাইয়েরা সকলেই আশপাশের বাড়িতে থাকতেন। তাই চাচা, ফুপুর সংখ্যাও ছিল অনেক। আমার ছোট দাদার মেজ ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান আমাদের বাড়িতেই হচ্ছিল। বিয়ের দায়িত্বটা বাবার কাধেও ছিল এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে বেশি পরিমাণেই ছিল। বিয়ের আয়োজনে অনেক কিছু কেনা হয়েছে, তার ভেতর শাড়ি তো অবশ্যই। মা, চাচিরাও বিয়ে উপলক্ষে শাড়ি পেলেন। মায়ের শাড়িটা ছিল ম্যাজেন্টা রঙের ওপর চুমকির কাজ করা। বিয়ের আসরে মা যখন শাড়িটা পরলেন তখন তাকে খুব সুন্দর লাগছিল।

আমাদের বাড়ি থেকে বরযাত্রা শুরু হলো। কনের বাড়ি গিয়ে নতুন চাচিকে দেখলাম নববধূর সাজে। বৌ খুব সুন্দর। কিন্তু মায়ের শাড়িটা সুন্দর। আমার মনের মধ্যে গেথে গেল, আমার একটা বৌ চাই আর মায়ের শাড়িটা চাই।

আমি বিয়ের আসরে এক সময় বলেই ফেললাম, মা, আমার বৌকে তোমার শাড়িটা দিও।

মা এ কথা শুনে হেসে ফেললেন। বড় পরিবারে ছোট ছোট কথা চারদিকে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আমার কথাটাও সকলে জেনে গেল। আর এই নিয়ে শুরু হলো হাসাহাসি। কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে কনেপক্ষের একটা বাচ্চা মেয়েকে ধরে আমার সঙ্গে তখনই বিয়ে দেয় আর কি! টানা হেচড়া, হাসি, তামাশা দেখে আমার শিশু মন বুঝে গেছে। বিয়ে খুব একটা সুখকর বিষয় নয়।
ততোক্ষণে বড়দের টানাটানি সইতে না পেরে বাচার শেষ অস্ত্র কাজে লাগালাম, ভ্যা...।
আমার কান্না শুনে মা এসে সেই যাত্রায় আমাকে সকলের কাছ থেকে উদ্ধার করলেন। তবে মাকে কখনোই আর ওই শাড়ি পরতে দেখিনি। দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। আমাদের বিয়ের বয়স হয়েছে। বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা সংসার করেছেন। আমিও ভালোবেসে বিয়ের পিড়িতে বসলাম। বিয়ের অনুষ্ঠানে মা যেতে পারলেন না অসুস্থ ছিলেন বলে। বিয়ে করে নতুন বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ঘরে ঢুকে শয্যাশায়ী মার সঙ্গে আমি ও আমার নবপরিণিতা সহধর্মিনী আলাপ করলাম। মা আমাদের উভয়কে আশীর্বাদ করলেন, মঙ্গল কামনা করলেন এবং তার শয্যার পাশ থেকে একটি শাড়ি আমার নববধূকে উপহার দিলেন।
আমি বিস্মিত হয়ে দেখছি শাড়িটি ছিল ২৫ বছর আগের সেই শাড়িটি যে শাড়ি শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানেই মা ব্যবহার করেছেন। তারপর তুলে রেখেছেন আমি বড় হয়ে বিয়ে করলে আমার স্ত্রীকে দেবেন বলে। ম্যাজেন্টা রঙের চুমকির কাজ করা এই শাড়িটা আমার স্ত্রীরও খুব প্রিয়। সে শাড়িটা খুব পছন্দ করেছে। সে কি জানে, এক মায়ের কতো স্বপ্ন, কতো ভালোবাসা, কতো আশা ওই শাড়ির প্রতিটি ভাজে ভাজে লুকায়িত?

টিওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা থেকে

ইজ্জত

– এম.এইচ.আই. খোকন

কি লিখবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। *ছাতা* বিশেষ সংখ্যার লেখাগুলো পড়ছিলাম। ছোটভাই রোকনের বিদায় দিতে গিয়ে বিমানবন্দর থেকে ছাতা প্রথম পর্ব কিনেছিলাম। ওকে বিদায় দিতে গিয়ে চোখে পানি এসেছিল। হাতে ছিল যাযাদি-র ছাতা সংখ্যা। অশ্রু লুকানোর জন্য মুখ ঢেকে ছাতা সংখ্যা পড়ছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য হলেও কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম। তাই যাযাদির শাড়ি সংখ্যায় লিখতে গিয়ে রোকনের কথা খুব মনে পড়ছে। শাড়ি নিয়ে হয়তো অনেকে অনেক রোমান্টিক, হাসি, আনন্দের কথা লিখবেন। আমি অন্য রকম একটা বাস্তব ব্যতিক্রমের কথা লিখছি।
শুক্রবার চাকরিজীবীদের দিনটি যেন বড় পাওয়া। আর এদিনে ফকির, মিসকিন, ভিক্ষুকদেরও বড় পাওয়া। বাড়ির বড় কর্তারা এদিন বাড়িতে থাকেন বলে সুযোগ মতো হানা দেয় ভিক্ষুকের দল। অন্যদিন বিভিন্ন দোহাই দিয়ে বিদায় করা যায়। আজ আর কি বলে বিদায় করা যাবে?
আম্মা গো, একডা পিন্দনের শাড়ি দিবেন, আমি বড়ই অসহায়। একডা শাড়িতে চলতে পারি না। আপনের পরনের পুরান ছেড়া শাড়ি না হয় দ্যান। আল্লাই আপনেরে বালা করবো।

কথাগুলো একটানা বলে চলছিল এক ভিখারিনী। এমন করুণ সুরে বলছিল যেন পাষাণেরও মন গলে যায়। আমার রুম থেকেই কথাগুলো শুনছিলাম এবং বিরক্তি বোধ করছিলাম।

আবারও ওই একই কথার পুনরাবৃত্তি। আমার মা একটু বেশি দয়াশীল। তিনি অল্প কিছুতেই গলে যান। আমি রুম থেকে বাইরে এলাম এবং দেখলাম এটা মধ্য বয়সী মহিলা। মধ্য বয়সী বললে ভুল হবে। হয়তো বা আটাশ কি ত্রিশ বছর বয়স হবে। শরীরে ছেড়া ময়লা একটা শাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। ব্লাউজ না থাকায় তার ঝুলে যাওয়া সরু লাউয়ের মতো অমসৃণ স্তন যুগল শাড়ির কিছু অংশ দ্বারা আবৃত। যা সাধারণত মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে না। এ বয়সের একটা মধ্যবিত্ত বা অভিজাত বংশের মেয়ে হলে নিশ্চয় তার পুষ্ট স্তন যুগল শাড়ি ভেদ করে ফুড়ে উঠতে চাইতো। খুব বিরক্ত হলাম। কারণ এ ধরনের মেয়েরা সাধারণত এভাবে কাকুতি-মিনতি করে শাড়ি বা অন্য জিনিস নিয়ে শস্তায় তা বিক্রি করে দেয়। এ ধরনের পেশা অনেকের আছে।

মহিলার মুখে আবারও একই কথা। আমার কেন যেন তার প্রতি মায়া হলো। মা আমার কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। আমি বুঝলাম মা তাকে একটা শাড়ি দিতে চাচ্ছেন।

মহিলাকে বললাম, তোমার স্বামী কি করে?

কি করবো? হেই তো আর একডা বিয়া করছে। হেই হের লগে থাহে।

কথাগুলো খুব অভিমানের স্বরে বললো। মা আমার নীরব সম্মতিতে তার একখানা শাড়ি দিলেন। মহিলার চোখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো। হয়তো মনে প্রাণ ভরে আমাদের জন্য দোয়া করলো। কিন্তু নিজের জন্য হয়তো সে কখনো দোয়া চায় না। যেন তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়। হয়তো মেনে নিয়েছে এটাই তার ভাগ্য। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা ভালো। তার কোলে ছিল পূর্ণ নগ্ন, নাকে-মুখে লালা ঝরছে এমন একটা সন্তান। ছেলে কি মেয়ে তা দেখে বোঝার উপায় ছিল না। ছোট। তাই তার আর শাড়ির প্রয়োজন হয়নি। সে তো একদিন বড় হবে। তারা ক্ষিধের জ্বালা হয়তো যে কোনোভাবে ডাস্টবিন বা অন্য কোনো জায়গা থেকে নিবারণ করবে। কিন্তু লজ্জা? লজ্জা কি দিয়ে নিবারণ করবে? শাড়ি তো ডাস্টবিনে পাওয়া যায় না।

এম.এম. কলেজ যশোর থেকে

আড়াল

– ডলি

তিথি মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো ইশতিয়াককে। ইশতিয়াক মাস দুয়েকের পরিচয়েই তিথিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিল। তিথি তার কুমারীত্ব বিসর্জন দিল ইশতিয়াকের কাছে। আর ইশতিয়াক যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। তিথিকে ভোগ করে সে মেতে উঠলো অন্য এক মেয়েকে নিয়ে। তিথি বুঝলো কি ভুল সে করেছে। এরই মধ্যে তার শরীরে সে নতুন একজনের অস্তিত্ব অনুভব করছে। সে বার বার ইশতিয়াকের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু ইশতিয়াক দেখা করে না।

উপায়ন্তরহীন তিথি আমাকে সব ঘটনা খুলে বললো।

তিথি আমার বোন।

সব শুনে বজ্রাহতের মতো বসে রইলাম। একজন নারী হয়ে বুঝতে পারলাম তিথির মনের অবস্থা।

ইশতিয়াকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাকে তিথির অবস্থা বলতেই সে সমস্ত কৃতকর্ম অস্বীকার করলো।
বাসায় ফিরে এসেছি। ভাবছি তিথিকে কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যাবো। সে রাজি থাকুক বা না থাকুক গর্ভপাত করাতেই হবে। বাসার কাছে আসতেই দেখি মানুষের জটলা। আমার বুক ধক করে উঠলো, তাড়াতাড়ি বাসায় ঢুকে দেখি তিথি মাটিতে শুয়ে আছে। তার গলায় ফাস। যে বয়সে তার শাড়ি পরে বৌ সাজার কথা সেই সময় শাড়ি দিয়ে ফাস বানিয়ে গলায় পরেছে।
তিথি মরে গিয়ে বেচেছে।
ইশতিয়াকও আগের মতো মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে যাচ্ছে। সুখে নেই শুধু আমরা। পাড়ায় নতুন কোনো লোক এলেই সবাই আঙুল তুলে আমাদের বাড়ি দেখিয়ে বলে এই বাড়ির এক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমরা তখন আড়াল খোজার চেষ্টা করি।

হালিশহর, চট্টগ্রাম থেকে

সংস্কার

– হেলেন আহমেদ

আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি। ১৯৫১ সাল। থাকি পুরান ঢাকার জিন্দাবাহার ফার্স্ট লেনে। পড়ি ইডেন কলেজে। বর্তমানে বদরুন্নেসা কলেজ। তখন আমাদের কোনো কলেজ ড্রেস ছিল না। শাদা বা হালকা রঙের শাড়ি অথবা সাধারণ সালোয়ার কামিজ পরতাম। একদিন কলেজের শাড়ি ধুয়ে দিয়েছি। বৃষ্টি ছিল বলে সেদিন শাড়ি শুকায়নি। পরদিন কাজের ছেলেকে শাড়িটা রোদে মেলে দিতে বললাম। কাজের ছেলেটা কাপড় মেলে দিয়েই চিৎকার করে বললো, আপনার শাড়ির আচল কাটা কেন?
দেখলাম, সত্যিই আচলের খানিকটা অংশ ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কাটা। আমার একমাত্র চাচা তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাস্টার্সে পড়ছেন। কাজের ছেলেটার চিৎকারে তার রুম থেকে বের হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে। শাড়িটা নতুন। আমার তখন কান্না পাচ্ছিল সুন্দর শাড়ির আচলটা নষ্ট হয়ে গেল বলে। কান্না চেপে হাত দিয়ে শাড়িটা দেখালাম। চাচা ভালো করে দেখলেন।
তারপর আমাকে বললেন, তুই কাপড় ছুসনে, দেখি কি করা যায়, বলে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা প্যাকেট নিয়ে বাসায় ফিরে এলেন। প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে বললেন, ওই শাড়িটা আর পরিস না, এটা পরিস।
আব্বা আম্মা তখন বাসায় ছিলেন না। একটু পরে তারাও বাসায় ফিরলেন। আব্বার হাতে কয়েকটা প্যাকেট। একটা প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বললেন, তোর কলেজের জন্য একটা শাড়ি আনলাম। তারপর চাচাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দোকানদার বললো, তুই সে দোকানে গিয়েছিলি শাড়ি কিনতে? দোকানদার জিজ্ঞাসা করছিল বাসায় কোনো অনুষ্ঠান আছে কি না।

ইসলামপুরের সেই দোকানটা আব্বার আর চাচার পরিচিত। চাচা বললেন, কে যেন হেলেনের শাড়ির আচল কেটেছে। তাই ওর জন্য শাড়ি কিনতে গিয়েছিলাম। মায়ের কাছে শুনেছি অবিবাহিতা মেয়ের শাড়ির আচল কাটলে অমঙ্গল হয়।
আম্মা বললেন, আমিও তাই শুনেছি।
আব্বা অবশ্য এসব সংস্কার বিশ্বাস করতেন না। বললেন, কে আর কাটবে? ইদুরে কেটেছে।
পরে খোজ করে জানা গেল আমাদের এক পুরনো কাজের ছেলে আমাদেরই এক আত্মীয়ের টাকা খেয়ে এই কাজ করেছিল। আম্মা পরে শাড়ির আচল ভালো করে কেটে এক গরিবকে দিয়ে দেন। হয়তো কুসংস্কার কিংবা চাচার তাৎক্ষণিকভাবে একটা শাড়ি আনার জন্য আমার কোনো অকল্যাণ হয়নি।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

অনিয়ন্ত্রিত

াড়ি পরা মেয়ে দেখলে কোনো ছেলের মাথা এতোটা খারাপ হয় তা জানতাম না। যেদিন জানলাম সেদিন থেকে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় আছি। সেই কথাই আজ লিখবো।
মিমি ও মামুন আমার খুব কাছের বন্ধু। মিমিকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি। আমরা যখন মেডিকাল কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন বন্ধুত্ব থেকে প্রেম হয় মামুন ও মিমির। তারপর ইন্টার্নি শেষ করার পর পরই ওরা বিয়ে করে এবং ঢাকায় চলে আসে। ঢাকায় থাকার সময়ে প্রায়ই ওদের বাসায় যেতাম, থাকতাম। যেহেতু দুজনই আমার বন্ধু, তাই খুবই যাতায়াত ছিল ওদের বাসায় শুধু আমি একা নই, আমাদের সব বন্ধুরাই তখন উত্তরবঙ্গের মেডিকাল কলেজ ছেড়ে ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছে। ওরা সকলেই মিমির বাসায় যেতো। এরপর ওদের দুজনের ২০তম বিসিএস–এ চাকরি হয়ে গেল। দুজনের পোস্টিং হলো দুই জেলায়। ঢাকা ছেড়ে গেলেও ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে মোবাইল ফোনের বদৌলতে মিমির সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথা হতো। একদিন শুনলাম, পথের দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে মিমি ও মামুনের মনের দূরত্ব অনেকটা বেড়ে গেছে। ভাবলাম বন্ধু হিসেবে ওদের সম্পর্কের উন্নতির জন্য কিছু করা দরকার। এদিকে কিছুদিন আগে মামুন ঢাকায় এলো একটা ট্রেনিং করতে। ভাবলাম ওর সঙ্গে দেখা করে শুনবো কি নিয়ে ওদের সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে এবং যতোদূর সম্ভব সমাধান করার চেষ্টা করবো। যেই ভাবা সেই কাজ।
অফিস শেষ করে একদিন মামুনের সঙ্গে দেখা করতে বের হলাম। আগেই ফোনে ঠিক করা ছিল ও পিজি হাসপাতালের গেটে দাড়িয়ে থাকবে। আমি পৌছাতে একটু দেরিই করলাম। গিয়ে দেখি মামুন যথারীতি দাড়িয়ে আছে।
আমাকে দেখেই বললো, শাড়ি পরাতে তোকে ভীষণ ভালো লাগছে।
বলা বাহুল্য, আমি শাড়ি পরে গিয়েছি। তারপর দুজন রিকশায় ঘুরলাম, কলাভবনের মাঠে গিয়ে বসলাম এবং ওদের সম্পর্কের অবনতির কারণগুলো শুনলাম। আমি যথাসম্ভব মামুনকে বোঝালাম। যাই হোক। তারপর আরো কিছুক্ষণ দুজনে গল্প করলাম, ঘুরলাম রিকশা নিয়ে।

মামুন মাঝে মধ্যেই বলছে, আমার মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজ তোকে কিস করবো।

ভাবলাম ও দুষ্টুমি করছে। কারণ এ ধরনের দুষ্টুমি সব সময়ই করে। কিন্তু না। এরপর মামুন আস্তে আস্তে আমার পিঠের কাছ দিয়ে ব্লাউজের নিচে পেটের অনাবৃত অংশে হাত দিল। যথেষ্ট অবাক হলাম এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে থামানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। ওর শক্তির কাছে পরাস্ত হলাম। অনেক বোঝালাম এটা উচিত না, অনৈতিক, অশোভন ইত্যাদি। মামুন কিছুতেই শুনলো না। পরবর্তী কালে হাত আরো উপরে উঠলো এবং জোর করেই মামুন আমাকে কিস করলো।

মামুন বললো, ব্যাপারটা অনিবার্য হতো না যদি না আমি শাড়ি পরতাম।

ও যে শাড়ি পরা মেয়ে পছন্দ করে সেটা আগেই জানতাম। কিন্তু নিজের ওপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে এটা জানতাম না। সেদিন থেকে খুব মানসিক যন্ত্রণায় আছি। সব সময় মনে হয় এ ঘটনার জন্য আমিই দায়ী। আমার সেদিন শাড়ি পরা উচিত হয়নি। আমি ওকে ছেড়ে দিই। সেদিনের পর থেকে এখন পর্যন্ত আর শাড়ি পরিনি।

মামুন এখন সংসার করছে।

তবে মজার কথা হলো মামুন এতো শাড়ি পছন্দ করে, অথচ ওর স্ত্রী প্রচণ্ড মোটা বলে কখনো শাড়ি পরে না।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রেস্টিজ

– আরিফুজ্জামান আরিফ

চাকরিতে ঢুকেছি। বাবা–মা বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মা–বাবার সঙ্গে অনেক মান অভিমানের পরে বিয়ে করলাম মামাতো বোন নাজুকে। দীর্ঘ তিন বছরের ভালোবাসা পূর্ণতা পেল বিয়ের মাধ্যমে। কিন্তু বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শাশুড়ি–বৌয়ের চিরন্তন দ্বন্দ্বে নতুন বৌয়ের মন রক্ষার্থে বাড়ি ছাড়তে হলো আমাকে।

এক রুমের বাসা ভাড়া নিলাম চাকরিস্থলে। যা বেতন পাই বাসা ভাড়া এবং নতুন বৌয়ের নিত্যনতুন আবদার মেটানোর পরে মাসের শেষে আর অবশিষ্ট কিছুই হাতে থাকে না।

সেদিন ছিল আমাদের তৃতীয় বিয়েবার্ষিকী। নাজুকে সারপ্রাইজ দেবো বলে অফিস থেকে ফেরার পথে বহু কষ্টে জমানো টাকা থেকে একটা ভারতীয় সুতি শাড়ি কিনলাম একশ বিশ টাকা দিয়ে। বাসায় এসে শাড়িটা তার হাতে দিলাম। একটু অবাক হলো প্রথমে। তারপর শাড়িটা ভালো করে দেখে আমার হাতে দিয়ে বললো, এ শাড়ি আমি ব্যবহার করবো না।

বললাম, কেন?

পাশের বাড়ির ভ্যানচালক ইসমাইলের বৌ এ একই ডিজাইনের শাড়ি পরেছিল গতকাল।

তাতে কি?

সে যে শাড়ি পরেছে, আমিও সেই শাড়ি পরলে আমার প্রেস্টিজ থাকে?

অবাক হলাম বৌয়ের প্রেস্টিজ জ্ঞান দেখে। আমার এতো কষ্টের টাকায় কেনা ভালোবাসার উপহার তার কাছে এতো মূল্যহীন। কথাটা ভাবতেই কষ্টে বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো। হায় ভালোবাসা! মনে পড়লো সেই বিখ্যাত উক্তিটি, *অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢোকে, ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়।*

আমার সেদিনের ভালোবাসার উপহার সেই শাড়িটি আমার প্রিয়া আমাকে খুশি করার জন্য একদিন পরেছিল। তারপর সেই শাড়িটা তাকে আর কখনো পরতে দেখিনি। জানি না এটার পরিণতি কি হয়েছিল। কখনো জিজ্ঞাসাও করিনি আজ পর্যন্ত কাকে দান করেছে শাড়িটা। তবে এখন প্রতিদিন বৌকে একটা করে দেশি শাড়ি কিনে দেয়ার ক্ষমতা আমার হয়েছে। কিন্তু সেদিনের পর থেকে আর কখনো নিজে বৌয়ের জন্য শাড়ি কিনতে দোকানে যাইনি।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া থেকে

সতর্ক দৃষ্টি

– সবুজ হাকিম

বাঙালি নারীর সৌন্দর্য শাড়িতে। অথচ আজ নারী সে শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার-কামিজ পরে হয়েছে আধুনিক। পাশাপাশি মা মেয়েকে চেনা যায় না।

সম্ভবত ১৯৯২-৯৩ সাল হবে। তারিখ মনে নেই। কোনো এক গ্রামীণ চালে পড়ে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে মানিকগঞ্জ থেকে চলে যাই সুদূর রংপুরে। ঠিকাদার পাড়ায় বোনের বাসায় থাকি এবং রংপুর ক্যাডেট কলেজের হোসনেআরা ম্যাডামের মেয়ে এশাকে পড়াই। ফলে প্রত্যেক দিন বিকেলে ক্যাডেট কলেজে যাওয়া পড়ে।

একদিন ক্যাডেটের দক্ষিণ-পূর্ব মূল ফটকের সামনে দাড়িয়ে কথা বলছিলাম শুভাকাঙ্ক্ষী সবুজের সঙ্গে। হঠাৎ দেখলাম, অদূরে রিকশা থেকে একটি কলেজ পড়ুয়া মেয়ে ছিটকে পড়লো। এগিয়ে গেলাম আমরা। মেয়েটি তখন অজ্ঞান এবং মাথাটা সামান্য ফেটেছে। ফলে রক্ত ঝরছে। সবুজ এবং আমি বিব্রত হলাম এ জন্য যে, তখন মেয়েটির শরীরে পেটিকোট ও ব্লাউজ ছাড়া কিছু ছিল না। সমস্ত শাড়ি পেচানো ছিল রিকশার চাকার মধ্যে। বুঝতে অসুবিধা হলো না। ততোক্ষণে দশ পনেরোজন পুরুষ-মহিলা জড়ো হয়ে গেল ঘটনাস্থলে। অন্য একটি রিকশায় একজন পথিক মহিলাকে দিয়ে দ্রুত পাঠালাম মডার্নে ডাক্তারের কাছে। আমিও পরে সবুজ ওই ছিন্ন শাড়িটা নিয়ে মডার্নে গেলাম। তখন মেয়েটির জ্ঞান ফিরেছে। জানতে পারলাম তার বাসা ধাপ মেডিকালে।

শাড়িটা পৌছে দিয়েছি। তবে ইচ্ছে করেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করিনি লজ্জায়। পরে তাকে বাসায় পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন অন্যান্যরা। বাসায় আসার পথে ভাবলাম, একটু অসতর্কতার কারণে মেয়েটির আজ এ অবস্থা। অন্যদিকে সালোয়ার-কামিজের উপকারিতাও কিছুটা অনুভব করলাম।

কাজেই রিকশা, সাইকেল অথবা হুন্ডায় যদি মহিলা ওঠেন তাহলে আপনারা সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন নিজের দিকে যাতে সামান্য কারণে এমন বড় বিপদ না ঘটে আপনার জীবনে। সদাসতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনা এড়ান।

জাবরা, ঘিরও, মানিকগঞ্জ থেকে